প্রমোদলহরী

অথবা

বিবাহ-রহস্য।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ
প্রণীত।

ঢাকা—আরমাণিটোলা,
বান্ধব-কুটীর হইতে
শ্রীহরকুমার বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৮ই চৈত্র ১৩০১।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের আভরণ

প্রীতিনিকেতন

পরোপকারব্রত

পণ্ডিত-রত্ন

ভিষক্-কুল-বরেণ্য

শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন

কবিরঞ্জন মহাশয়ের

কর-কমলে

গ্রন্থকারের

অকৃত্রিম প্রীতি ও স্নেহের

উপহার।

বিজ্ঞাপন।

মানবসমাজের মূলসূত্র অথবা মুখ্য বন্ধনী বিবাহ। ফলতঃ, বিবাহ লইয়াই সমাজ,—বিবাহবন্ধনেই সমাজের সৃষ্টি ও স্থিতি; এবং বিবাহধর্ম্মের ক্রমোন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। সুতরাং কথাটা সকলেরই আলোচ্য। বান্ধব নামক সাহিত্যপত্রে বিবাহ ও বিবাহ-শৃঙ্খল-বদ্ধ মনুষ্যজীবনের সুখ ও দুঃখ এবং আশা ও আশঙ্কার নানারূপ সমালোচনায় বহুকাল হইল কএকটি প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছিল। এই পুস্তকের এক অংশ সেই কয়টি পুরাতন প্রবন্ধ, এবং আর এক অংশ 'বিবাহ কত প্রকার' নামক একটি নূতন প্রবন্ধ। যে গুলি পুরাতন, সেগুলিও, নূতনের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষার অনুরোধে, এত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে যে, সমস্ত পুস্তকখানিরে নূতন-লিখিত বলিলেও, তাহা অসঙ্গত হয় না। কিন্তু প্রবন্ধ নূতন বলিয়া প্রবন্ধের কথাগুলিও যে নূতন, ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না। যাহার চক্ষু আছে, সেই দেখে; যাহার অতি সামান্য বুদ্ধি আছে, সেই দৃষ্টবিষয়ের যথামতি সমালোচনা করিয়া থাকে। আমি সমাজের অবস্থা দেখিয়া সামান্যতঃ যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে সমালোচনা করিয়া পাঠককে বুঝাইতে যত্নপর হইয়াছি। যদি এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া একটি পাঠকও প্রাচীন আর্য্যের প্রীতি ও ভক্তিমূলক পবিত্র ধর্ম্ম অর্থাৎ পর-চিত্ত-প্রীণনের জন্য আত্মোৎসর্গের ভাবকে দাম্পত্যজীবনের

আদর্শ বলিয়া হৃদয়ে অনুভব করেন, আমি তাহা হইলেই, আমার এই পরিশ্রম সফল মনে করিব।

পুরাতন প্রবন্ধ গুলির অধিকাংশই জ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নামে পত্রস্থ হইয়াছিল। নূতন প্রবন্ধটিও, সেই হেতু, জ্ঞানানন্দের নামেই পুস্তকে গ্রথিত হইল। ইহার একটুকু উদ্দেশ্য আছে। মনুষ্যমাত্রই একে এক শত। সে কখনও যোগী, কখনও ভোগী, কখনও বিরক্ত সন্ন্যাসী, কখনও বা বিষয়সুখাসক্ত বিলাসী। ইহা মানবজীবনের নিত্যপরীক্ষিত কথা। জ্ঞানানন্দ বিষয়বন্ধনশূন্য অথচ প্রফুল্লচিত্ত ও প্রমোদপ্রিয় পরিব্রাজকের চক্ষে যে ভাবে সমাজ সমালোচনা করিয়াছেন, সেই ভাবটির স্বাতন্ত্র্যরক্ষার নিমিত্তই তাঁহার নামটা রক্ষা করিতে হইয়াছে। অপিচ, এক সময়ে বঙ্গদেশের অনেক পাঠক জ্ঞানানন্দী লেখায় বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহাদিগের সেই দয়া ও অনুগ্রহের সম্মানরক্ষাও ঐ নাম ব্যবহারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

এই পুস্তকের ভাষাসম্বন্ধেও এখানে দুই একটি কথা বলিব। বাঙ্গালায় আনন্দ ও মজা,—স্বভাব ও মেজাজ,—রীতি ও রেওয়াজ, —পরিচ্ছদ ও লিবাজ,—অপূর্ব্ব ও আজগুবি,—এবং কল্পনা ও খেয়াল এই উভয় প্রকার শব্দই ইদানীং একই অর্থে প্রায় সমান ব্যবহৃত হইতেছে। মজা ও মেজাজ প্রভৃতি শব্দ, যাবনিক হইলেও, হিন্দু ও মুসলমানের একই দেশে অবস্থাননিবন্ধন, এইক্ষণ দেশীয় বাঙ্গালায় ব্যবহারে আসিয়াছে। কিন্তু সে ব্যবহারে, সময়, সঙ্গী ও বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে, সর্ব্বত্রই একটুকু বিশেষ পার্থক্য সাবধানতার সহিত পরিরক্ষিত হইয়া থাকে। বাগ্‌বাহার প্রভৃতি

উর্দ্দু গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদে শব্দনির্ব্বাচন বিষয়ে ঐ রূপ সাবধানতার কোন পরিচয় না থাকিলেও, হিন্দুসমাজের প্রচলিত বাঙ্গালায় সর্ব্বদাই উহার পরিচয় পাওয়া যায়। উপাসনা ও আরাধনায় বড়ই এক আজগুবি মজা আছে, এমন কথা হিন্দু লিখিতে পারে না,—হিন্দুর লেখনীতে ইহা আইসে না। আজি গুরুদেবের মেজাজ বড় গরম দেখিলাম,—অথবা আলুলিত-কুন্তলা শকুন্তলার সে অপূর্ব্ব লিবাজ ও রেওয়াজ দেখিয়া দেলটা বড় খোস হইল, ইত্যাদি বাক্য বঙ্গবাসী হিন্দুর নিকট বড়ই বিকট বলিয়া বোধ হয়। কারণ, উপাসনা ও আরাধনার ধারে মজা, গুরুদেবের ধারে মেজাজ, এবং তপোবনবাসিনী ঋষিকন্যার বর্ণনায় লিবাজ ও রেওয়াজ প্রভৃতি শব্দের সমাবেশ দেশীয় শতসহস্র লোকের সংস্কার বিরুদ্ধ। কিন্তু, মজা, মেজাজ ও রেওয়াজ প্রভৃতি শব্দ যে তাই বলিয়া বাঙ্গালার আর কোথাও স্থান পাইবে না, এমন কোন কথা নাই। আমি এই সকল এবং আরও বহুবিধ কারণে, কিবা উপন্যাসী, কিবা উদ্দীপনার উত্তাল-তরঙ্গ-বিলাসী, কোন এক প্রকারের ভাষাকেই সকল প্রকার বিষয়ের উপযোগী বলিয়া মনে করি না। লোকে পাট্টা ও কবুলিয়ত প্রভৃতি দলিল লিখে এক প্রকার শব্দে, এবং প্রেম, বিরহ ও প্রাণের অন্তর্নিহিত দুঃখের গীত গায় আর এক প্রকার শব্দে ;—গুরুজনের সহিত কথোপকথনে অথবা পুত্র কি শিষ্যস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সম্ভাষণে এক প্রকারের শব্দ ব্যবহার করে, এবং আমোদ-প্রমোদের বৈঠকে—সমানবয়স্ক প্রণয়িজনের সহিত নিঃসঙ্কোচ আলাপে—আর এক

প্রকার শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। অথচ উভয়ই এক ভাষা। প্রমোদ-লহরীর ভাষাও এই নিমিত্তই প্রভাত-চিন্তা ও নিভৃত-চিন্তার ভাষা হইতে অনেক অংশে পৃথক্। আমি ভরসা করি, সহৃদয় পাঠক দৃষ্টিমাত্রই বুঝিতে পাইবেন যে, এই পার্থক্য বিষয়গত পার্থক্যেরই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবি ফল।

"বিবাহ কত প্রকার" এই প্রবন্ধের বিবরণঘটিত বহু কথাই হর্বট্ স্পেন্সর (Herbert Spencer) কৃত 'সমাজবিজ্ঞানের মূলসূত্র,' জে, জি, উড (J. G. wood) কৃত 'মানবজাতির প্রাকৃত ইতিহাস,' আর্মিনিয়াস্ ভাম্বিরী (Arminius Vambery) প্রণীত 'মধ্য এসিয়ার ভ্রমণবৃত্তান্ত' এবং হণ্টার (Hunter) প্রণীত 'বঙ্গদেশের বিবরণসংগ্রহ' প্রভৃতি ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় বিবাহপ্রথার অনেক কথা সুযোগ্য বন্ধু বান্ধবের নিকট পত্র লিখিয়াও পরিজ্ঞাত হইয়াছি। কোন কোন স্থলে পুঁথিতে যাহা আছে, ঠিক্ তাহাই তুলিয়া দিয়াছি; কোন কোন স্থলে পুঁথির লিখিত কথা পরিত্যাগ করিয়া পত্রের লিখিত কথাই প্রামাণিক জ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছি,—অথবা এক পুস্তকের কথা পুস্তকান্তরের নির্ভরে অংশতঃ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছি। যাঁহাদিগের পুস্তক অথবা পত্র হইতে বিবরণ-সঙ্কলনে সাহায্য পাইয়াছি, আমি এই স্থলে তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি।

বান্ধব-কুটীর,
আরমাণিটোলা—ঢাকা;
১৮ই চৈত্র, ১৩০১।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

সূচীপত্র।

প্রমোদলহরী।

বিবাহ।

১

(প্রলাপ।)

আমার এ পোড়া হৃদয় বুঝুক আর না বুঝুক, এবং যার যা বলিবার হয় বলুক, আমি বিবাহ করিব না। আমার আত্মাভিমানিনী, আত্মাভিসারিণী, উন্মাদিনী বুদ্ধি আমাকে আমার আত্মার বাহিরে অন্য কাহারও সঙ্গে বিবাহের বন্ধনে বদ্ধ হইতে দিবে না। বিবাহ করিব কেন?—সুখের জন্যে?—আমার সুখ এইক্ষণ আমার আপনার অধিকারে আছে, তাই ভাল। আমি সুখের লালসায় পরের হাতে প্রাণ তুলিয়া দিতে সম্মত হইব না। কবিকল্পিত বিদ্যাধরী কিংবা বন-দেবী যেমন

মায়াতরুর মূলে বসিয়া, আপনার আদরে আপনি গলিয়া—আপনার ভাবে আপনি ঢলিয়া, ঢল ঢল চিত্তে বলিয়াছে,—

'আমি ত প্রাণ দেব না, প্রাণ নেব না,
আপন প্রাণে ভাল বাসি,'

আমার ঐ অভিমান-বিলাসিনী নিত্যবিসংবাদিনী, বিভ্রান্ত বুদ্ধিও, আপনার অনুরাগে আপনি উছলিয়া, মান-ভরে ফুলিয়া, এইরূপ বলিতেছে,—

আমি ত প্রাণ দেব না, প্রাণ নেব না,
আপন প্রাণে ভাল বাসি,
আমি আপন দুঃখে আপনি কাঁদি,
আপন সুখে আপনি হাসি ॥

আমার এই প্রাণ আজও যেমন আমার রহিয়াছে,উহা চিরদিন তেমনই আমার রহুক। আমি উহা কাহারও কাছে বাঁধাও দিব না, বিক্রয়ও করিব না; যেমন আছে তেমনই থাকুক। বাঁধা দিতে আমার বড়ই আপত্তি। বাঁধা দিলে কি বাঁধা পড়িলে, এবং কুশীদজীবীর কালা খাতায় খাতকের ফর্দ্দে নাম লিখাইলে; বন্ধকের বস্তু ফিরিয়া আবার পাও কি না পাও, চিরজীবনের জন্য সুদের দায়ে ঠেকিলে। এ সংসারে অনেকেই বিক্রয়ের

নামে ভয় পাইয়া, আপনার প্রাণটি কাহারও না কাহারও কাছে দুচারি দিন, কি দুচারি বছরের তরে বাঁধা দিয়াছে, এবং পরিশেষে সোহাগের সুদ যোগাইতেই একেবারে দেউলিয়া বনিয়া, মনের আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে। এমন বেহিসাবি বন্দোবস্ত, এমন ক্ষতিকর ব্যাপারেও কি বুদ্ধিমান্ লোকের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে?

কিন্তু, বাঁধা দেওয়া যদি দোষের কথা, বিক্রয়ও ত নিতান্ত গুণের কথা নহে। বিক্রয় সে হিসাবে বরং অধিকতর অনিষ্টজনক। পৃথিবীর বণিক্‌সম্প্রদায় সোনা রূপা, তামা কাঁসা, মণি মুক্তা প্রবাল, অথবা বনের কাঠ, খনির অঙ্গার এবং সুঁই সুতা ও লতা পাতা লইয়া যেমন দোকান খুলিয়া বসে, কিংবা মাথায় পসরা লইয়া ফিরিওয়ালার মত বাণিজ্যে বাহির হয়, আমি কি আমার এত সাধের এই প্রাণটি লইয়া সেইরূপ বেচা কেনার এক দোকান খুলিয়া বসিব, অথবা প্রাণের পসরা মাথায় বহিয়া, দেশে দেশে, নগরে নগরে, এবং গ্রামে গ্রামে ও গৃহে গৃহে ফিরি করিতে যাইব? প্রাণ লইয়া বাণিজ্য! হা ধিক্! এই স্বার্থচিন্তাময় মনুষ্য-জগতে ইহার ক্রেতা কৈ? কয় জনে ইহার গৌরব বুঝে? কয় জনে ইহার মূল্য জানে? আর, বুঝিলে এবং জানিলেও উপযুক্ত

মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে প্রস্তুত হয়, এই পৃথিবীতে তেমন উদারপ্রকৃতি মান্য গণ্য মহাজনই বা ক জন আছে?

ধূলির মনুষ্য ধূলিরই মূল্য বুঝে এবং দোকানদারিতেই মুগ্ধ হইয়া থাকে, প্রাণের মূল্য বুঝে না; এবং যে রীতিমত দোকানদারি করিতে না জানে, তাহাকে জিজ্ঞাসাও করে না। সাধারণ মনুষ্যের নিকট একটি স্বর্ণাঙ্গুরি কিংবা একখানি স্বর্ণবলয় যেমন মূল্যবান্, একটা বাল্মীকি কি ভবভূতির প্রাণ তাহার অর্দ্ধ মূল্যের সমান কি না, সন্দেহ।

যাহারা প্রাণের বাণিজ্যে অগ্রসর, তাহারাও বাহিরের আবরণ এবং আনুষঙ্গিক লাভালাভের যেমন অনুসন্ধান করে, বাণিজ্যের প্রকৃত বস্তুটি যথার্থ মূল্যবিশিষ্ট কি না, তাহা তেমন করিয়া দেখিয়া লয় না। তুমি একটি সরল, সুমধুর ও সুস্বাদু প্রাণ লইয়া এই ভবের বিপণিতে ঘুরিয়া বেড়াও; কিন্তু উহার বহিরাবরণটি যদি গিল্টি করা ও চকচ'কে না হয়, কেহই তোমার প্রতি ফিরিয়া চাহিবে না। তুমি মহত্ত্ব ও মনস্বিতার প্রস্রবণ স্বরূপ আর একটি স্বভাব-সুন্দর প্রেম-পূর্ণ প্রাণ লইয়া ফিরি করিয়া দেখ। কিন্তু তুমি যদি উহা লইয়া জাত দোকানদারের মত গলাবাজি করিতে না পার, এবং ব্যবসায়ি-

দিগের নীচবৃত্তি ও নিকৃষ্ট পদ্ধতিতে লাভের কথাটা ভাল করিয়া শুনাইতে সক্ষম * না হও, তাহা হইলে কেহই তোমার মধুর কথায় মন দিবে না।

ইহা নূতন নহে। পৃথিবীর বাণিজ্য বরাবরই এই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। এখানে গুণাগুণের বিচারের আশা বৃথা। কত প্রতিভাশালী, প্রীতিমনোহর, প্রধান পুরুষ লজ্জায় ও দুঃখে অধোবদন হইয়া অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং তাহাদিগের দুঃখ ও লজ্জা, যেন মুক্তার হারে পরিণত হইয়া, মর্কটের গলায় শোভা পাইতেছে। কত কোকিল, কাক-কোলাহলে পরাভব পাইয়া, বনের প্রান্তে বসিয়া বিলাপ করিতেছে। কত ভৃঙ্গ, ভেকের বিকট-ধ্বনিতে হারি মানিয়া, চিত্তের পরিতাপে গুন্ গুন্ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে; এবং কত প্রকারের কত গুণবান্ প্রার্থী, মণিমণ্ডিত গর্দ্দভের নিকট বাণিজ্যের সেই বিচিত্র যাচাইতে, পরাজিত হইয়া, আপনার জ্বালায় আপনি জ্বলিতেছে।

---

* সংস্কৃত সাহিত্যে সক্ষম শব্দের ব্যবহার নাই; বাঙ্গালায় আছে। বাঙ্গালায় উহা বিশিষ্টরূপে প্রচলিত, অথচ ব্যাকরণ অনুসারেও শুদ্ধ। ভাববাচি ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত ক্ষম্ বিশেষ্য। অর্থ—সামর্থ্য, শক্তিমত্তা। সুতরাং সক্ষম ও সমর্থ এই দুই শব্দ একার্থবোধক। মান্ততা হেতু উপান্ত অকারের বৃদ্ধি নিষেধ।

আমি এই নিমিত্তই আমার বুদ্ধির অটল গরিমায় মনে মনে প্রায় অটল সংকল্প করিয়াছি যে, না হয় সুখ নাই হইল, আমি প্রাণ লইয়া বাণিজ্য করিব না। অনেকেই, লাভের তরে ব্যাপার করিতে যাইয়া, মূলধনে বঞ্চিত হয়। আমি দুঃখে থাকি তাহাই আমার সুখ। কিন্তু তথাপি এমন বিড়ম্বনার বাণিজ্যে বিড়ম্বিত এবং লাভের মধ্যে আমার মূলধনে বঞ্চিত হইয়া মূর্খ নাম কলাইব না।

আর বাণিজ্যের ফল?—যাহারা জিনিষের গৌরব বুঝে, তাহারাও কি উপযুক্ত মূল্য দেয়? যদি ক্ষণকালের তরেও কল্পনার দিব্য কর্ণ পাইতে পার, তাহা হইলে ঐ শুন ক্রেতারা কি বলে। কেহ বলিতেছে,—ওহে ও প্রাণের বণিক্! এস, এস। আমার কাছে বিশ্ববিখ্যাত "পরজিৎ" ফুলের মধু আছে। তুমি আমার কাছে এস। পারিজাতও পরজিতের কাছে পরাজয় মানে। যোগ-শাস্ত্রে উহার এক নাম মায়া, আর এক নাম মমতা। "প্রকৃতিবাদে" উহারই অন্য নাম প্রাণজিৎ। প্রাণিমাত্রই উহার অধীন, এবং উহাই তোমার ঐ সাধের প্রাণটির উপযুক্ত মূল্য। আমি তোমায় ফোটা ফোটা করিয়া সে মধুর ফুলের মধু খাওয়াইব, তুমি প্রতিদানে আমায় তোমার ঐ প্রাণটি দিয়া কৃতার্থ হও। কেহ বলি-

তেছে,—এস এস, আমার কাছে তোমার ঐ প্রাণের পসরা লইয়া এস। তুমি বৃথা কেন বাজারে বাজারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হইতেছ। আমি তোমায় প্রাণের মূল্যে একটুকু আদরের আতর এবং আবদারের এক খানি সাজানো ডালি উপহার দিব, আর আমার এই আঁচলে তোমায় ঢাকিয়া রাখিয়া তোমার সকল আশা সফল করিব। তুমি আমায় তোমার ঐ প্রাণটি দিয়া চরিতার্থ হও। তৃতীয় একজনে বলিতেছে,—ওহে আমার নিকট আদরও নাই, আবদারও নাই, ভ্রান্তির একখানি ভবদুঃখহারি দর্পণ আছে। আমি তোমায় সে ভ্রান্তির দর্পণে একখানি অপূর্ব্ব ছবি দেখাইয়া তত্ত্ববিদ্যার সকল রহস্য শিখাইব। তুমি গুরুদক্ষিণার বিনিময়ে আমায় তোমার ঐ সামান্য প্রাণটি দিয়া জীবনে সার্থক হও। চতুর্থ একজনে বলিতেছে,—আমি তোমায় ছবি দেখাইতে না পারিলেও, ত্রিতন্ত্রীর মৃদু গুঞ্জনের ন্যায় মিষ্টকথার মঞ্জু কূজনে, মোহিত রাখিব, তুমি আমায় তোমার ঐ প্রাণটি দিয়া প্রাণে সুধাসিক্ত হও। পঞ্চম একজন ইহার কিছুই না বলিয়া দর্প-স্ফুরিত-কণ্ঠে দর্প-সহকারে বলিতেছে যে,—আমি তোমায় আমার পদসেবা করিতে অধিকার দিব, আর যদি তুমি ভক্তিমান্

বণিক্ হও ও তোমার সুবুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে কখনও কখনও তোমাকে বিনা মেঘে ঝটিকার ভীষণ-শোভা ও বিলোল-নৃত্য এবং মদিরার সরস-বিলসিত সজীব মূর্ত্তি দর্শন করাইব, তুমি তোমার ঐ প্রাণটি ভক্তির ভাবে আমার পায়ে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হও।

ক্রেতারা এমনই কিছু একটাই কহিয়া থাকে। কিন্তু হায়! কেহই এমন কথা ভুলিয়াও কয় না যে, আমি, তোমায় প্রাণের মূল্যে প্রাণ দান করিব,—তোমার প্রাণে আমার প্রাণ বিনিময় করিয়া—প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া ফেলিব,—তোমাতে আমি ডুবিয়া থাকিব, এবং আমাতে তোমাকে ডুবাইয়া রাখিব, আমাকে তুমি তোমার ঐ প্রাণটি দিয়া কিনিয়া নেও। যে বাণিজ্যে কাচের মূল্যে কাঞ্চন বিক্রয় হয়, যদি সেই বাণিজ্যই প্রবঞ্চনা বলিয়া তিরস্কৃত হইতে পারে, তাহা হইলে যে বাণিজ্যে মধু ও মদিরা এবং আদর ও আতরের দরে মনুষ্যের অনন্তবিলাসী অবিনাশী প্রাণ বিক্রীত হয়, তাহাকে প্রবঞ্চনার পর প্রবঞ্চনা, প্রতারণার পর প্রতারণা এবং ছলনার পর ছলনা বলিয়া ঘৃণা করিব না কেন?

ইহার পর স্বাধীনতা। বণিগ্বৃত্তির ক্রয় বিক্রয়ের কথায় স্বাধীনতাকে কি একবারে হিসাবেই আনা হইবে

না? উহার কি কিছুই মূল্য নাই? যে স্বাধীনতাকে কবিতা স্বর্গ-সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে,—দেবতারা স্বর্গ হইতেও গরীয়সী জ্ঞানে পূজা করিয়াছেন, সেই স্বাধীনতার কি কিছুই গৌরব নাই? মানিলাম তুমি মহাজনের ধর্ম্ম জান এবং মহাজনি ধর্ম্মের মহত্ত্ব রক্ষার নিমিত্ত প্রাণের বদলে প্রাণ বিলাইতেও প্রস্তুত আছ। কিন্তু তাহা বলিয়াই কি আমি যেমন তেমন একটা প্রাণের বিনিময়ে আমার প্রাণ-গত-স্বাধীনতা রূপ অমূল্য সম্পদ্ জন্মজন্মান্তরের তরে তোমার নিকট বিক্রয় করিব? আমি আজ আমারই আছি,—সর্ব্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে ও কড়ায় ক্রান্তিতে আমার। আমায় কেহ ঠোঁটে করিয়াও উড়িয়া বেড়ায় না, এবং গলায় শিকলি বাঁধিয়া কিংবা নাসারন্ধ্রে সূতা গাঁথিয়াও টানিয়া লইয়া যায় না। আমি আজ কাহারও অধীন নহি। কেহই আমাকে দাস বলিয়া পদ-নখে স্পর্শ করিতে পারে না, অথবা ওঠ বলিয়া উঠায় না* এবং ব'সো বলিয়া বসাইয়া

---

* অকৃতদার জ্ঞানানন্দ এই কথা গুলি সম্ভবতঃ শরৎসরোজিনী নামক সখের নাটক পড়িয়া শিখিয়া থাকিবেন। যথা,—

"শরৎ। তিন ঘণ্টা ধরে জ্বালাচ্ছিলে কেন, রাক্ষসি? পাঠশালের গুরুমহাশয়ের মত 'ওঠ বস' করাচ্ছিলে কেন, রাক্ষসি? 'সরোজ। (সহাস্যে) তোমাকে আবার 'ওঠ বস' করালেম কখন। গুরু মহাশয় বা হলেম কখন।"

রাখিতে সাহস পায় না। আরব্য উপন্যাসের গিরি-প্রস্থবাসী বৃদ্ধ যেমন হতভাগ্য সিন্ধুবাদের স্কন্ধে সওয়ার হইয়াছিল, আমার স্কন্ধে কেহই তেমন সওয়ার হইতে পারে না, এবং মিশররাজ্যের মায়াবিনী যেমন রোমের এক অদীন-সত্ত্ব বীর-পুরুষকে বড়শীতে * গাঁথিয়া দিগ্‌দিগন্তরে ঘুরাইয়াছিল, কেহই আমাকে সেইরূপ গাঁথিয়া সেই ভাবে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইতে সমর্থ হয় না। আমার এমন যে স্বাধীনতা,—এমন যে সাম্রাজ্যদুর্ল্লভ সৌভাগ্য, ইহা আমি একটা কথার ছাঁদে কি চাহনির ফাঁদে পড়িয়া ক্ষতিলাভ গণিয়া না দেখিয়া,—অগ্রপশ্চাৎ কিছুমাত্র না ভাবিয়া, অকারণে ডালি দিতে যাইব? তুমি আত্ম-দানে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কিনিয়া লইতে সম্মত হইয়াছ বলিয়াই কি আমি, "রাজি রগ্‌বতে বহাল তবিয়তে," তোমার চক্ষে দেখিব, তোমার কর্ণে শুনিব, এবং কাব্যের নবরস ও কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি কাব্যাতিরিক্ত ভোগ্যের ছয় রস তোমার জিহ্বায় চাখিতে আরম্ভ করিব? ইহারই নাম কি সুখের সার এবং সংসার-সমুদ্রের সারভূত সুধা?

---

* বড়শীর কথাটা রূপক নহে। বীর-চূড়ামণি এণ্টনী সত্য সত্যই ক্লিওপেট্রার বড়শী ধরিয়া জলে ভাসিয়াছিলেন।

আজি আমার চিত্তের গতি অক্ষুণ্ণ ও অসীম,—সৃষ্টির অপরিসীম রাজ্যে এমন কোন স্থান নাই, এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার অনধিগম্য। আমি কখনও সূর্য্যলোকে, কখনও চন্দ্রলোকে,—কখনও সমুদ্রে কখনও পর্ব্বতে;—কখনও বিহঙ্গের পক্ষে ঐ সুনীল নভ-স্থলে,—কখনও শফরীর মত সরোবরের শীতল জলে! আমার প্রাণ কোথাও পিঞ্জর-বদ্ধ নহে,—কিছুতেই আমাকে বাঁধিয়া রাখে না এবং কিছুতেই আমার কল্পনার বিচিত্র-বিলাসে বাধা দিয়া উহাকে এক স্থানে কি একই ভাবে আবদ্ধ করে না। দেখ, আজি আমি বসন্তের সমীর। বসন্তের সমীর যেমন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়,—কুসুমের প্রস্ফুটিত মাধুরী লইয়া ধীরে ধীরে খেলা করে, আমিও সেইরূপ আমার উচ্ছৃঙ্খল প্রাণ ও উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার মৃদু সমীরে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হই,এবং এই বিশ্বরূপ বিনোদ-কাননের প্রস্ফুটিত শোভা লইয়া ধীরে ধীরে খেলা করি। আবার দেখ, আজি আমি বৈশাখের ঝড়। কৈ, কোথায় সেই শান্তি? কোথায় সেই মৃদুল-তরঙ্গ? আমি এইক্ষণ নিবিড়-কৃষ্ণ নীরদ-মালায় অঙ্গ ঢাকিয়া,—দামিনীর জ্বলন্ত রূপে অঙ্গ আবরিয়া,—কণ্ঠে দামিনীর জ্বলন্ত হার পরিয়া, গৃহ উপগৃহ, বন উপবন, লতাবিতান ও লতাবন্ধনে বদ্ধ

উদ্ধত পাদপ লইয়া ভীম-গর্জ্জনে ব্যায়াম ও মল্লক্রীড়া করিতেছি, এবং সম্মুখে যাহা কিছু পড়িতেছে, তাহাই ভাঙ্গিয়া চূরিয়া কিংবা উড়াইয়া নিয়া বিষাদের উন্মাদ-হাস্যে হাসিতেছি। এই আমি গঙ্গার জল,—কল-কল নাদে বহিয়া যাইতেছি,—জানি না কোথায় যাই; এই আমি নিস্তব্ধ যামিনীর নিদ্রালস জ্যোৎস্না,—নদীর জলে ফুলের গায়ে কিংবা বৃক্ষের ছায়ায় নিদ্রাবেশে ঢলিয়া পড়ি,—জানি না কবে জাগিব? আমার এই স্বাতন্ত্র্য সুখ, এই অনির্ব্বচনীয় আমিত্ব ও একত্ব কি একটা অপরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞেয় প্রাণের লোভে বিসর্জ্জন করিব?

আমার এই আমিত্বই আমার কুঞ্জকানন,—এই একত্বই আমার পুষ্পিত প্রমোদ-বন। আমি এখানে বিশ্ববিস্মৃত হইয়া একাকী বিরাম করি, এবং বিশ্বের সকল প্রকার বাদ-বিসংবাদ চিত্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া একাকী আপনাতে ডুবিয়া থাকি। এখানে বিষয়ের কর্কশ কণ্ঠধ্বনি ও ঈর্ষ্যার তুষানল প্রবেশ-পথ পায় না, এবং আশা ও নৈরাশ্যের বিষাদ-দোলাও এখানে দোলায়িত হয় না। এখানে আমি আপনাতেই আপনি নিত্যপ্রীত, আপনাতেই আপনি নিত্যস্থিত;—মান নাই, বিরহ

নাই, প্রণয়ের কৃত্রিম কি অকৃত্রিম কলহ নাই; সকল সময়ে এবং সকল ভাবেই একাকী আমি এক। ভোগ-রত মনুষ্য আমার এই অপার্থিব ও অমানুষ আনন্দের পরিচয় পায় না বলিয়াই কি আমি, এত চিন্তার পর, আমার এই নিৰ্ম্মুক্ত জীবনে উপেক্ষা করিয়া, বংশীমুগ্ধ বন-কুরঙ্গের মত, বাগুরায় আবদ্ধ হইব?

তবে এক কণ্টক হৃদয়। হৃদয়ের মত কুবুদ্ধির অধ্যাপক, কুমতির অগ্রনায়ক, কুচক্রী ও কূট-ভাষী আর নাই। আমি পূর্ব্বেই আভাসে ইহা জানাইয়াছি যে, ঐ হৃদয়ই আমার সকল আকাঙ্ক্ষার আদি কারণ, সকল আশার অন্তরায়। আমি হৃদয়ের জ্বালায়ই সতত অধীর থাকি, কিছুই করিয়া উঠিতে পারি না। মনে আমার কত বিষয়েই কত সংকল্প ছিল, হৃদয়ের উত্তাপে ও উত্তেজনায় তাহা পুষ্পপত্রলগ্ন তুষার-কণার মত দ্রব হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। এইক্ষণ তাহার চিহ্নও আর নাই। মনে কত বিষয়েই কত কঠোর কামনা ছিল, হৃদয়ের আতট-বাহি তরঙ্গাঘাতে তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে। এইক্ষণ স্মৃতিপটেও তাহার পূর্ব্বতন রেখাপাত দৃষ্ট হয় না। হৃদয়ের কিসে উন্মূলন হইতে পারে, মনুষ্য কি কোথাও সেই দুরধিগম্য বিদ্যার মূল তত্ত্ব শিখিতে পাইবে না?

হৃৎপিণ্ডটাকে কেমন করিয়া নখে ছিঁড়িয়া পৃথিবীর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব,পশ্চিম, এই চারি দিকে ছড়াইয়া দেওয়া যায়, পৃথিবীর কোন ক্যাণ্ট্,*কোন কোমৃটই † কি তাহার উপায় দেখাইবে না? আমার চক্ষু আমার নহে, সে হৃদয়ের আজ্ঞাবহ। আমি যাহা দেখিতে নিষেধ করি, সে হৃদয়ের অস্ফুট আদেশে তাহাই দেখিবার জন্য আকুল হইবে। আমার কর্ণ আমার নহে, সে হৃদয়ের দাস। হৃদয় যাহা শুনিতে বলে, আমার সহস্র শাসন-সত্ত্বেও, তাহাই সে তৃষ্ণা পূরিয়া শুনিবে, এবং হৃদয় যাহা শুনিতে বারণ করে, আমি শত বলিলেও তৎসম্পর্কে সে বধির রহিবে। অধিক আর কি বলিব, আমি যে প্রাণটি লইয়া এত গৌরব করি,—যাহা এত যত্নে, এত সাবধানে অন্তরের অন্তর মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে চাহি, তাহাও ফলতঃ ঐ হৃদয়ের। যেখানে হৃদয়,সেই খানেই আমার প্রাণ;—বৃক্ষ আর ছায়া, মুহূর্ত্তেরও ছাড়াছাড়ি নাই।

হৃদয়, স্বভাবতঃ অতি দুর্ব্বল হইলেও, এই বলেই বলীয়ান্

---

* জর্ম্মণ দেশের বিখ্যাত দার্শনিক, এবং ইউরোপীয় বহু দার্শনিকের গুরু। ইনি ভক্তিপথের পথিক।

† প্রত্যক্ষবাদী সম্প্রদায়ের আদিপ্রবর্ত্তক। ইহাঁর মতে পরার্থপ্রীতি এবং পরকীয় সুখের জন্য হৃদয়-দানই ধর্ম্মের চরম সম্পদ্।

হইয়া, আমার অভিমানকে উপহাস করে, অভিমান-বর্দ্ধিত বুদ্ধিকে বালকের ক্রীড়াকন্দুক বলিয়া অবলীলাক্রমে ধিক্কার দেয়, বিবেককে বাতাহত দীপ-শিখার ন্যায় চঞ্চল করিয়া তুলে, কল্পনাকে প্রীতির পবিত্র পদ্মাসনে টানিয়া লইয়া যায়; এবং আমি যখনই একটু নিভৃতে বসিয়া চিন্তার গাম্ভীর্য্যে অটল হইতে চেষ্টা করি, তখনই 'মনুষ্য তোমায় চিনি' এই বলিয়া, মৃদু হাসি হাসিয়া, আমার ভ্রূকুটি-ভঙ্গির ভীষণতাতেও পর-মুখ-প্রেক্ষিতা ও পরাধীনতার ছায়া ফলায়। আমি এই জন্যেই এক এক বার ভাবি যে, যদি অভীষ্ট-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে যেরূপে কেন হউক না, আমার পাষাণ-কঠিনা বুদ্ধির সহিত সর্ব্বাগ্রে ঐ হৃদয়েরই একটা বিবাহ ঘটাইব; এবং যদি তাহাও একান্ত অশক্য হইয়া উঠে,—যদি হৃদয় আর বুদ্ধি বর-কন্যার বেশ ধারণ করিয়া একে অন্যকে বিবাহ করিতে কোন মতেই সম্মত না হয়, তাহা হইলে দেখিয়া শুনিয়া, পরখ করিয়া, যে আমায় প্রসন্ননয়নে সম্ভাষণ করে, তাহাকেই নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ বলিয়া প্রীত ও প্রসন্নমনে এই হৃদয়টা একবারে, চিরজীবনের তরে, উৎসর্গ করিয়া দিয়া ফেলিব। উন্মূলন করিতে নাই বা পারিলাম, দান করিতে আর ঠেকায় কে? এবং হৃদয়টা যদি একবার দিয়া ফেলিতে

পারিলাম, তাহা হইলে আমার বুদ্ধি ও অভিমান এবং চিত্তনিহিত সংকল্পেরই বা আর বিঘ্ন থাকে কোথায়?

তখন এক বারের স্থলে অনন্তবার গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারিব যে, আমি আর বিবাহ করিব না। দেখ, এক-মাত্র হৃদয়ই আমার শত্রু হইয়া, আমাকে বিবাহের বন্ধনে বান্ধিতে চাহিয়াছিল; আমি সেই হৃদয়কেও এইক্ষণ বিনা মূল্যে বিলাইয়া দিয়া আমার মনোরাজ্যে নিষ্কণ্টক, নিরুপ-দ্রব ও শত্রুশূন্য হইয়াছি। আমি এইক্ষণ আর ভয় করিব কার? এবং আমাকে আর উৎপীড়নই বা করিবে কে? আমার ভয় এবং উৎপীড়ন, জ্বালা ও যন্ত্রণা, সমস্তই এইক্ষণ পরের ঘরে। হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের যদি বিবাদ বাধে, ত সেখানে বাধিবে। আমার তাহাতে কি? আমি ইহাতে বরং যার পর নাই সুখী হইব, এবং যে জ্বালায় আমি জ্বালাতন রহিতাম, অন্যে তাহার দ্বিগুণ জ্বালায় দগ্ধ হইয়া দুটি হৃদয়ই পুনরায় তাহার প্রাণ, মন ও সর্ব্বস্ব দক্ষিণার সহিত ফেরত দেওয়ার অভিলাষে কাতর-স্বরে যাচ্ঞা করিতেছে, ইহা দেখিয়া আনন্দে ভাসিব।

বিবাহ।

২

(ব্যাকরণ-রহস্য।)

সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্র এক অতলস্পর্শ অপার জলধি। উহা শুধু ব্যাকরণ কিংবা ভাষাবিজ্ঞান নহে। উহার অভ্যন্তরে স্মৃতি, নীতি,—সাহিত্য, সংগীত,—যোগ, ভোগ,—এবং ইতিহাসাদি আরও কত শাস্ত্রের কত নিগূঢ়রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে আমার জড়বুদ্ধি বিস্ময়ে আরও জড়ীভূত হইয়া পড়ে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, আধুনিক সমাজ-তত্ত্বেরও অনেক গভীর কথা, উহার গভীর জলের অন্তঃস্থলে, উপলখণ্ডের ন্যায়, লুক্কায়িত আছে। এখানে দুই একটি সূত্র তুলিয়া উদাহরণ দিব। যাঁহারা ব্যাকরণে নিতান্ত বিদ্বেষী, তাঁহাদিগেরও ভীত হইবার কারণ নাই। কারণ সূত্রগুলি সাধারণতঃ সরল ও সুখ-পাঠ্য, এবং কখনও কখনও ঠিক কবিতারই মত কোমল ও কাম্যপ্রদ। যথা,—

"দশ সমানাঃ"

অর্থাৎ, দশ জনকে লইয়া সমাজ, সুতরাং সমাজে দশ জনই সমান।*

এই এক সূত্রেই সাম্যবাদের সারোদ্ধার ও শেষ-সিদ্ধান্ত অতি সংক্ষেপে পরিব্যক্ত হইয়া রহিল। ইহার পর আর, সামাজিকদিগের মধ্যে এক জনে আর এক জনের উপর বড়াই করিবে কি বলিয়া? যাহার অর্থ আছে, তাহার হয় ত বিদ্যা নাই। যাহার বিদ্যা আছে, তাহার হয় ত অর্থ নাই। তুমি জাতিতে বড়, কিন্তু চরিত্রে ছোট; আর এক জন জাতিতে ছোট হইয়াও চরিত্রে বড়,—চরিত্রের মহত্ত্বে তোমার গুরুস্থানীয়। কাহারও রূপ আছে ত গুণ নাই, কাহারও গুণ আছে ত রূপ নাই। কেহ সোনার সিংহাসনে বসিয়াও প্রকৃতির নীচতায় পিশাচ-সদৃশ; কেহ কাঙ্গালের পর্ণকুটীরে বাস করিয়াও

* দুর্গসিংহকৃত বৃত্তি ও ব্যাখ্যা অবশ্যই অন্য প্রকার। কিন্তু, কোন্ বৃত্তি ও কোন্ ব্যাখ্যা সূত্রের সহিত বেশী মিলে, তাহা বিচার করিয়া অবধারণ করা আমাদিগের পক্ষে অসাধ্য। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীমান্ কল্যাণভট্ট পরিব্রাজক, দুর্গসিংহের পথ পরিত্যাগ করিয়া, ভাল করিয়াছেন কি না, পাঠক ক্রমে তাহার পরিচয় পাইবেন।

জ্ঞানের জ্যোতি এবং প্রকৃতির উচ্চতায় রাজরাজেশ্বর।

কিন্তু, যদিও সকলেই সমাজের গাঁথনিতে সমান, তথাপি সেই দশ জন সামাজিকের মধ্যেও সবর্ণতা অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীন সজাতীয়তা কেবল যোড়ায় যোড়ায়। যথা,—

"তেষাং দ্বৌ দ্বাবন্যোন্যস্য সবর্ণৌ"

অর্থাৎ, ইতঃপূর্ব্বে যে দশ জনের কথা কথিত হইয়া আসিয়াছে, তাহারা দুইটি দুইটি করিয়া, যোড়ায় যোড়ায়, একে অন্যের সবর্ণ।*

এই যে যোড়াবান্ধা যুগল ভাবের উল্লেখ হইল, ইহাই দাম্পত্য-ধর্ম্মের মূলসূত্র। কেন না, জগতে দম্পতি অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী ভিন্ন কে আর কার সহিত যোড়াবান্ধা যুগল বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে? স্বামী স্ত্রী শুধুই পরস্পরের সমান নহে; কিন্তু তাহারা সমান অথচ পরস্পরের সবর্ণ। হা মিল! তুমি কোথায়? তুমি স্বামী স্ত্রীর সাম্য এবং স্ত্রীজাতির সমান অধিকার বিষয়ে যত কিছু লিখিয়া গিয়াছ, ভারতের একজন বৈয়াকরণ যে, তোমার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, এত অল্পাক্ষরে তাহা সূত্রে গাঁথিয়া গিয়াছেন, ইহা তুমি স্বপ্নেও জানিতে পাও নাই।

---

* এবার সূত্রার্থে কোন গোলযোগ নাই। কারণ সূত্রে আছে "দ্বৌ দ্বৌ" এবং তাহার স্পষ্ট অর্থ দুইটি দুইটি করিয়া।

দম্পতির এই সাম্যনীতির মধ্যে আরও কত গূঢ় কথা আছে, তাহারও আলোচনা কর। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের সমান, পরস্পরের সবর্ণ, অথচ আবার তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরে একটুকু বিচিত্র পার্থক্য আছে। যথা,—

"পূর্ব্বো হ্রস্বঃ, পরো দীর্ঘঃ।"*

অর্থাৎ, সাংসারিক সুখ-সম্পদের সকল কথায়ই স্বামী একটুকু হ্রস্ব এবং স্ত্রী একটুকু দীর্ঘ। স্বামীর কণ্ঠধ্বনি যেখানে নিখাদে পড়িয়া থাকে, স্ত্রীর মধুর কণ্ঠের মোহন-ধ্বনি, সেখানে ধৈবতের হুঙ্কারে উঠিয়া, প্রেমের বীণায় নানারসে ঝঙ্কার দেয়। সূত্রকার এখানে স্বামীকে ছোট বলেন নাই। কারণ, তাহা হইলে সে কথা সাম্যবাদের বুকে বাধিত। তিনি ছোট না বলিয়া হ্রস্ব বলিয়াছেন। সুতরাং এ হ্রস্বতা নিশ্চয়ই "স্বর-প্রক্রিয়া" বিষয়ক। এ স্থলে এইরূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে এই রস-মধুরা দীর্ঘতা কেন? ব্যাকরণে ইহারও উত্তর আছে। স্ত্রী দ্রবময়ী,—

---

* কল্যাণভট্ট এবার দুইটি সূত্র মিলাইয়া এক সূত্র করিয়াছেন। নব্য বৈয়াকরণের মধ্যে অনেকেই এই পথ দেখাইয়াছেন। সুতরাং ইহা প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধ নহে।

"স্ত্রী নদীবৎ"

বঙ্গদেশের বিদ্যারত্ন ও তর্কবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ যে কেন শুধু ব্যাকরণের * অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা লইয়াই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন, এই একটি সূত্রের অর্থবিবৃতিতেই তাহার প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হইতেছে। সূত্রটি কেমন মনোজ্ঞ, কি মধুর!

স্ত্রী নদীবৎ

অর্থাৎ, স্ত্রী নদীর মত, অথবা স্ত্রী আর নদী সমান।† প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মুখে শুনিতে পাই যে, এক দেশের এক রাজার ছেলে, তাঁহার বিদ্যাভিমানিনী বিনো-

* এই ব্যাকরণের এক নাম কাতন্ত্র, আর এক নাম কৌমার এবং তৃতীয় নাম কলাপ। কাতন্ত্র শব্দের অর্থ অল্প শাস্ত্র, অর্থাৎ অল্প বয়সের উপযোগী আমোদের কথা। কৌমার মানে কুমারের যোগ্য অর্থাৎ যুব-জন-স্পৃহণীয়। কলাপ শব্দের অর্থ অধিকতর রসাল। অর্থাৎ যাহা পড়িয়া রস-শাস্ত্রের চৌষট্টিকলায় বিদ্যা জন্মে তাহার নাম কলাপ। যাঁহারা "অঃ ইতি বিসর্জ্জনীয়ঃ" এই সূত্রের বৃত্তি পড়িয়াছেন, তাঁহারাই এ কথার সাক্ষী। কিন্তু রসিকতার অংশটা বৃত্তিতেই কিছু বেশী।

† দুর্গসিংহ এ সূত্রের যেরূপ জটিল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সাধারণ বুদ্ধির সুগম নহে। সুতরাংই কল্যাণকৃত ব্যাখ্যা প্রামাণিক।

দিনীর কাছে শব্দার্থের বিচারে অথবা স্বর-প্রক্রিয়ার অনুচিত দীর্ঘতায় পরাভব পাইয়া, প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, এবং তার পর তাঁহার গুরুদেব * আসিয়া তাঁহাকে এইরূপ কএকটি সূত্র শিখাইয়াই সর্ব্ব-শাস্ত্রে সর্ব্বজ্ঞ করিয়া তুলেন। এ কাহিনীটি ইতিহাসের চক্ষে সত্য কি না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু, এই শেষোক্ত সূত্রটি যেরূপ হৃদয়গ্রাহী, রস-ভাব-গভীর এবং রহস্যপূর্ণ, তাহাতে ইহা সহজেই অনুমিত হইতেছে যে, সেই পদাঘাত-পীড়িত "প্রণয়-ব্রীড়িত" রাজনন্দন, ইহা পাঠ করিয়া, আর কোন শাস্ত্রে পদ-প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইয়া না থাকিলেও, সমাজ-বিজ্ঞানের পুরাতন তত্ত্বে অতি সহজেই পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

স্ত্রী নদীবৎ! অহো কি জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য! অহো কি সূক্ষ্মানুসন্ধান! কিবা দার্শনিক কিবা বৈজ্ঞানিক, সকলকেই এই সূত্রার্থের নিকট মাথা নোয়াইতে হইতেছে। কে এই সূত্রের প্রতিবাদ করিবে? স্ত্রী প্রকৃতই নদীর

* গুরুদেবের নাম সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য। তিনি ভারতবর্ষে একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ কলাপ ব্যাকরণ পূর্ব্ববঙ্গের গৃহে গৃহে পঠিত ও পাঠিত হইয়া থাকে।

ন্যায়। কোথাও মৃদুবাহিনী, মৃদু-মধুর-হাসিনী, কুলু-কুলু-কল-নাদিনী; কোথাও তরঙ্গ-ভঙ্গি-ভয়ঙ্করা তট-ঘাতিনী কূল-নাশিনী। কোথাও পবিত্র তীর্থস্বরূপা, প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী; কোথাও প্রমোদ-লীলাময়ী ভোগবতী; কোথাও ক্ষীণ-তোয়া সরস্বতী; কোথাও করতোয়া, * কর্ম্ম-নাশা, অথবা তপতী† কি ইরাবতী। যদি সুখে, সোহাগে কিংবা স্বর-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে চাও, তাহা হইলে স্ত্রীই নদী। যদি দুঃখে একবারে ডুবিয়া রহিতে চাও, তাহা হইলেও স্ত্রীই নদী। কিন্তু, আমি এই দুইয়ের সাদৃশ্য বর্ণন লইয়া আর বৃথা শ্রম করিতে যাইতেছি কেন?

---

* সক্রেতিশের সহধর্ম্মিণীরে "করতোয়া" বলা যাইতে পারে। কেন না, তাঁহার হৃদয়ে যখনই ক্রোধের তুফান বহিত, তখনই তিনি পতির গায়ে জল ঢালিয়া দিতেন। ' কর্ম্মনাশা ঠাকুরাণীরা আর এক শ্রেণির। তাঁহারা গায়ে জল দেন না, কিন্তু উৎসাহের আগুনে জল ঢালিয়া কর্ম্ম নাশ করেন। '

† যাঁহাদিগের সমস্ত কথায়ই সন্তাপের সুদীর্ঘনিঃশ্বাস পরিলক্ষিত হয়, এবং যাঁহারা বিলাপ ও পরিতাপের কথা ভিন্ন আর কোন কথাই ভালবাসেন না, তাঁহাদিগকে তপতী বলা যায় না কি?—ইরাবতী পাষাণ-ভেদিনী। পৃথিবীর কোথাও প্রকৃত ইরাবতীর অভাব নাই।

যাঁহারা ব্যাকরণের আলোকে বিজ্ঞান পড়িয়াছেন, অথবা বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাকরণের সূত্রার্থ বুঝিতে যত্ন পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করিবেন যে,—স্ত্রী নদীবৎ।

সূত্রার্থে যেমন ব্যাকরণের অপূর্ব্ব বৈভব, শব্দার্থের ব্যুৎপত্তিতেও ব্যাকরণের তেমনই অপরূপ গৌরব। একমাত্র দুহিতা শব্দের ব্যুৎপত্তিতেই এই কথার প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে পার।

ব্যাকরণে যাঁহার সামান্য দৃষ্টি আছে, তিনিই জানেন যে, দুহিতা এই শব্দটি দুহ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, এবং দুহ ধাতুর অর্থ দোহন। ইয়ুরোপের সুপ্রসিদ্ধ শাব্দিকেরা, এই দুহ ধাতুর উপর দৃষ্টি রাখিয়া,এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যখন প্রাচীন আর্য্যসন্তানেরা কৃষিকার্য্যের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন, তখন তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই গোস্বামী অর্থাৎ বহুসংখ্য গোরুর অধিপতি ছিলেন। গৃহস্থ সমস্ত দিন ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য করিতেন, কন্যা গৃহে থাকিয়া গোদোহনে ব্যাপৃত রহিতেন। এই নিমিত্তই গৃহস্থের নাম ক্ষেত্রপাল, এবং এই নিমিত্তই কন্যার নাম দুহিতা। প্রিয়তম জ্ঞানানন্দও দুহ ধাতুকেই দুহিতা শব্দের মূল বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু

তিনি অন্যরূপে ধাত্বর্থের ব্যবহার দেখাইয়া থাকেন। তাঁহার মতে পিতৃকুলরূপ কামধেনুকে দোহন করাই দুহিতার প্রধান কার্য্য ; এবং যিনি পিতৃকুলকে যে পরিমাণে অধিক দোহন করিতে পারেন, তিনিই সেই পরিমাণে উৎকৃষ্টতর দুহিতা।* ইহার কোন্ অর্থ অধিকতর সঙ্গত, তাহা লইয়া এইক্ষণ বিচার কি বিতণ্ডা করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, ইহার যে অর্থই স্বীকার কর, তোমাকে অবশ্যই ইহা মানিয়া লইতে হইবে যে, ব্যাকরণশাস্ত্র সর্ব্বতোভাবেই সমাজবিজ্ঞানের ভাষ্যপ্রদীপ।

বিবাহ সম্বন্ধেও ব্যাকরণে এইরূপ অনেক মৌলিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে। বিবাহ কি?—বিবাহ কেন?—বিবাহের শেষ পরিণতি কিসে? এই সকল কথা লইয়া সকলেই ইতিহাসাদি অন্ধশাস্ত্রের আলোড়ন করিয়া থাকেন; এবং ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, কেহই ব্যাকরণের উজ্জ্বল আলোকে এই জটিল বিষয়ের মূল-

* যাঁহারা পতিকুলরূপ কামধেনুকেও, দুহিতার ভাবে, পিতৃকুলবৎ, দোহন করেন, তাঁহাদিগকে কি বলা যায় তাহা ভট্টবৈয়াকরণ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এই বার আর তাঁহার প্রাণের বন্ধু জ্ঞানানন্দের দোহাই দিলে চলিবে না। কথাটা একটু কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে।

তত্ত্ব পাঠ করিতে যত্নপর নহেন । কিন্তু, আমার এইরূপ বোধ হয় যে, ব্যাকরণের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলে উল্লিখিত সমস্যাত্রয়ের সুচারু মীমাংসা করিতে মুহূর্ত্তেরও বিলম্ব হয় না।

ব্যাকরণের মতে বিবাহ কি ?—না, প্রবাহ। বিবাহে জীব-প্রবাহ, বিবাহে সংসারপ্রবাহ এবং বিবাহেই সাংসারিক সুখ-দুঃখের চিরপ্রবাহ। বিবাহ না থাকিলে, এই সৃষ্টিপ্রবাহ প্রস্রবণেই শুকাইয়া যাইত, জীব ও জীবনের প্রবাহ নিরুদ্ধ রহিত, এবং বিশ্বজগতের পরমাণুপুঞ্জ উচ্ছৃঙ্খল আবর্ত্তে অনন্তকাল নৃত্য করিত। সুতরাং বিবাহ আর জীবন-প্রবাহ এক কথা।* বিবাহ না থাকিলে, এই সংসারে লতা থাকিত না, পাতা থাকিত না, ফুল থাকিত না, ফল থাকিত না, বন থাকিত না, উদ্যান থাকিত না, বনে বৃক্ষ থাকিত না, উদ্যানে অঙ্কুরের উদ্গম থাকিত না, জলে মাছ থাকিত না, আকাশে পাখী উড়িত না, সুতরাং

---

* পাঠকের ইচ্ছা হইলে, তিনি ব্যাকরণের এই সমস্ত কথার সহিত ডারউইনের যৌন-নির্ব্বাচন বিষয়ক নব্য বিজ্ঞান অথবা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত নূতন দর্শনাদি শাস্ত্রের সারসিদ্ধান্ত মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

বিবাহই এই সংসার * এবং সাংসারিক সম্পদ ও সৌন্দর্য্যের আদি প্রবাহ। বিবাহ না থাকিলে, প্রেমিকের প্রেম থাকিত না, বিরহীর বিরহ থাকিত না; কবির কাব্য থাকিত না, কবিতায় কুটিল কটাক্ষের কথা থাকিত না, পৃথিবীতে পরিবার-বন্ধন এবং পারিবারিক সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ কিছুই থাকিত না। সুতরাং বিবাহই † সুখ-দুঃখের চিরপ্রবাহ। উহা কাহারও ভাগ্যে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখপ্রবাহ এবং অনেকের ভাগ্যে সুখ-দুঃখের মিশ্রিত প্রবাহ। কিন্তু উহা যে সর্ব্বাংশেই একটি তর-তরবাহী অথবা মন্থরগামী প্রবাহ,—জ্যোৎস্নার তরঙ্গে তরঙ্গায়িত অথবা অন্ধকারের অবসাদে আবৃত সজীব প্রবাহ, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বিবাহ কেন? অর্থাৎ বিবাহের মূল উদ্দেশ্য কি?—

---

* আপনার কয় বিবাহ এইরূপ প্রশ্ন না করিয়া আপনার কয় সংসার, এইরূপ প্রশ্ন করাই প্রাচীন প্রথা ছিল। কিন্তু সংসার শব্দ যে এ স্থলে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, ইহা বলা বাহুল্য।

† এই প্রবন্ধে বিবাহ শব্দের অর্থ নিশ্চয়ই এক দিকে বিজ্ঞান আর এক দিকে প্রেম ও বিরহের অনুরোধে একটুকু সম্প্রসারিত হইয়াছে, এবং লেখক নিশ্চয়ই মনুর ব্যবস্থা এবং কাব্যনাটকাদির বর্ণিত অবস্থাও চিন্তা করিয়াছেন।

না, নির্ব্বাহ। বিনা বিবাহে মনুষ্যের জীবন-নির্ব্বাহের কিছুই সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখ। যাহাকে সাধারণ লোকে সাধারণতঃ জীবনযাত্রা বলে, আমি শুধু তাহারই কথা বলিতেছি না। কিন্তু পৃথিবীর অসাধারণ লোকেরা অসাধারণভাবে * যাহাকে জীবনের চরমলক্ষ্য ও পরমগতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারও নির্ব্বাহ বিষয়ে বিবাহই প্রধানতম সাধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেন না, বিনা বিবাহে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মনুষ্যোচিত প্রীতি, ভক্তি, মহত্ত্ব, মাধুর্য্য, উদারতা ও সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা প্রভৃতি ভাবের পরিপূর্ণতা লাভ অসম্ভব। সুতরাং, ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, বিবাহেই মনুষ্যের নির্ব্বাহ,—আশার নির্ব্বাহ, আকাঙ্ক্ষার নির্ব্বাহ, জীবনযাত্রার নির্ব্বাহ, জীবনের উন্নতি ও গতি এবং নিত্য নূতন বিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তের নির্ব্বাহ।

* পূর্ব্বতন দার্শনিকদিগের মধ্যে প্লেটো, অধ্যাত্মবাদের আচার্য্যদিগের মধ্যে সুইডেনবর্গ এবং আধুনিক মনস্বিসমাজের অগ্রগণ্য চালক কোম্‌ট্‌ ও মিলের লেখা আর এই শেষোক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের জীবনচরিতের সহিত বিবাহবিধির গূঢ়তত্ত্ব তুলনা করিয়া দেখিলেই উল্লিখিত কথার মর্ম্মার্থ স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে।

বহুবিবাহ যাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্যবসায়, অর্থাৎ যাহারা দালালি ও ঘটকালি, কিংবা ওমেদারি ও চাটুকারি প্রভৃতি কোন রূপ সম্ভ্রান্ত বিষয়কার্য্য, অথবা সভ্যমহলে অশ্লীল কথার, নব্যমহলে অস্পৃশ্য মদিরার ও অভব্য ছেলেমহলে অন্তঃশোষক সুদের বাণিজ্য প্রভৃতি কিছুই না করিয়া বিবাহের প্রসাদাৎই পঞ্চব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন—এবং যাঁহারা নিজ নিজ পত্নীদিগকে পত্তনীতালুক মনে করিয়া খাতায় তাঁহাদিগের নাম ধাম ও আয় ব্যয়ের তালিকা রাখেন, তাঁহারা হয়ত সাধারণ মতেরই পোষকতা করিয়া বলিবেন যে, বিবাহই যে নির্ব্বাহ এই স্বতঃসিদ্ধ ও চিরপ্রসিদ্ধ কথার প্রামাণিকতার জন্য এত পুঁথি পত্র এবং এত লেখক ও ভাবুকের নাম করিবার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নটি আপাততঃ নিতান্ত সহজ বোধ না হইতে পারে। কিন্তু আমি প্রথমেই ইঙ্গিতে ইহার উত্তর করিয়াছি এবং এইক্ষণ স্পষ্টতার অনুরোধে অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে, নির্ব্বাহ বলিলে তাঁহারা যাহা বুঝেন, জ্ঞানভ্রান্ত অসাধারণেরা তাহা বুঝেন না। প্রাচীন শাস্ত্রভ্রান্তেরা ভার্য্যাকে শরীরার্দ্ধা* মনে করিয়া জীবন নির্ব্বাহের যেরূপ অর্থ করিয়া

* "শরীরার্দ্ধা স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা।"

গিয়াছেন, আমিও এ স্থলে প্রেমভ্রান্তিতে নির্ব্বাহ শব্দের সেই অর্থই গ্রহণ করিলাম। যদি তাহা না করিয়া শাল বনাত, খাট পালঙ, গাড়ী ঘোড়া, বাড়ী ঘর, অথবা দক্ষিণ হস্তের দক্ষিণালাভকেই নির্ব্বাহ বলিয়া স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে আমি বিবাহের পরিবর্ত্তে বেনেতি বস্তু লইয়া বণিগ্বৃত্তি অথবা বাঙ্গালা পুস্তকরচনা প্রভৃতি অন্য কোন অক্লেশসাধ্য অর্থকর ব্যবসায়ের জন্যও ব্যবস্থা দিতে পারিতাম।

ইহার পর আর এক প্রশ্ন রহিয়াছে, বিবাহের শেষ পরিণতি কিসে? ব্যাকরণের উত্তর,—সংবাহে। সংবাহ শব্দের প্রচলিত অর্থ পাদ-মর্দ্দন। ব্যাকরণের এই ব্যবস্থাটি পাঠকবর্গের বড়ই অপ্রীতিকর জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞ ও বহুজ্ঞ, তাঁহারা সরলহৃদয়ে স্বীকার করিবেন যে, পৃথিবীর বহুস্থলেই যেরূপ বিবাহ এইক্ষণ প্রচলিত রহিয়াছে, পাদমর্দ্দনে কিংবা পাদবন্দনেই তাহার পরিণাম। বিবাহে পত্নী পতির দাসী, অথবা পতি পত্নীর দাস। কেন না, বিবাহ বিষয়ে জগতে প্রেমভক্তির সুখ-সুন্দর সাম্যবিধি এখনও প্রচলন পায় নাই। যেখানে পত্নী পতির ক্রীতদাসী, সেখানে পাদসেবাই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম, এবং আহার ও বিহারের সঙ্গে সঙ্গে প্রহার

অথবা সংহারেই * তাঁহার শেষ দক্ষিণা। আর, জামাই-বারিকের চিড়িয়াখানা প্রভৃতি যে যে স্থলে পতিটি পত্নীর ক্রীতদাস, সেখানেও পাদলেহন, পাদসেবন ও পাদমর্দ্দনই তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য, এবং মধ্যে মধ্যে প্রণয়-জলধির প্রলয়োচ্ছ্বাস স্বরূপ পদাঘাতই তাঁহার প্রধান দক্ষিণা। যেখানে প্রীতির সেই পরমা গতি এবং প্রণয়-জনিত সাম্যব্যবস্থার সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়, সেখানেও কি পাদসংবাহরূপ ক্লেশকর অথবা কমনীয় নীতির সম্যক্ উন্মূলন হইয়া থাকে? শাস্ত্রে এমন লিখে না। ভক্ত কবি জয়দেবের গীত-গোবিন্দে আছে,—

"মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

* এখানে অনুপ্রাসরূপ উপসর্গের অনুরোধে প্রহারের সঙ্গে সংহারও আপনি আসিয়া পড়িয়াছে। যথা,—

উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে
প্রহারাহার-সংহার-বিহার-পরিহারবৎ।

কিন্তু যেখানে প্রকৃতিগত উপসর্গ একটু বেশী প্রবল, সেখানেও যে আহার ও বিহারের সঙ্গে প্রহার এবং প্রহারের সঙ্গে সংহার কি পরিহার আসিয়া উপস্থিত না হয়, এমন কথা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি না। যাঁহারা ইংরেজী বিনা বুঝেন না, তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, পরিহার মানে Divorce.

অর্থাৎ,

আমার এ শিরের ভূষণ,
শিরে তুলি দেও প্রিয়ে
ও রাঙা চরণ।

ভবভূতি রামচন্দ্রের প্রণয়বর্ণনায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"দেবি! দেবি! অয়ং পশ্চিমস্তে রামশিরসা পাদ-পঙ্কজস্পর্শঃ।"

অর্থাৎ,——দেবি, রামের মাথা যে তোমার পায়ে লুণ্ঠিত হইত, আজি এই তাহার শেষ।

সুতরাং ইহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কি ভাল অর্থে, কি মন্দ অর্থে, কি বিবাহবন্ধনের উৎকর্ষে, কি উহার অপকর্ষে, কি প্রীতির পূর্ণবিকাশে, কি প্রীতির অপূর্ণ আভাসে, সকল স্থলে এবং সকল অবস্থাতেই বিবাহের শেষ পরিণতি সংবাহে। যদি তুমি একটা বড়ই কিছু হও, তাহা হইলে তিনি তোমার পদ-সংবাহ করিতেছেন, এবং যদি তিনি একটা বড়ই

* এই টুকু পড়িলেই বোধ হয় যে, সীতার পদ-সংবাহন অথবা তদীয় সুকোমল পদারবিন্দে শিরোলুণ্ঠন পুরুষ-প্রবীর শ্রীরাম-চন্দ্রের নিয়তকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। নতুবা কবি এখানে পশ্চিম শব্দের প্রয়োগ করিতেন না। পশ্চিম অর্থ শেষ।

কিছু হন, তাহা হইলে তুমি তাঁহার পদ-সংবাহ করিতেছ। অথবা, যেখানে উভয়ে উভয়ের সমান, সেখানে উভয়েই উভয়ের সংবাহসুখে বিবাহের সার্থকতা সম্পাদনে যত্নবান্ আছ।

ব্যাকরণে আরও এই এক গুরুতর কথা জানা-যাইতেছে যে, প্রবাহ—নির্ব্বাহ—সংবাহ এই যে বিবাহ-বন্ধনের তিন ভাব অথবা তিন অবস্থা ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে, এই তিনেরই মূল ধাতু বহ অর্থাৎ বহন। সুতরাং ইহা সহজেই উপলব্ধ হইতেছে যে, যখন বিনা বাহনে বহন হয় না, তখন যেই তুমি বিবাহ করিলে, অমনই তুমি বাহন হইলে। আগে বিযুক্ত এবং অতএবই উন্মুক্ত মনুষ্য ছিলে, বিবাহের পর-ক্ষণ হইতেই নিযুক্ত এবং অতএবই ভার-যুক্ত বাহন বনিলে।* আগে পাখীর মত উড়িয়া বেড়াইতে, জলের মত হাসিয়া খেলিয়া, ঢেউ তুলিয়া, চলিয়া যাইতে; বিবাহের পর-মুহূর্ত্ত হইতেই কিবা জীবনের প্রবাহে, কিবা জীবনযাত্রার নির্ব্বাহে, সকল ভাবেই পরের ভার হৃদয়ে লইলে,—আপনার সুখ-দুঃখ এবং বর্ত্তমান ও

* "বনিলে" এই ক্রিয়াপদটি ব্রজভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। ইহা এইক্ষণ বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত।

ভবিষ্যতের দুর্ব্বহ ভারের সঙ্গে সঙ্গে পরের সুখ-দুঃখ এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অধিকতর দুর্ব্বহ, দুর্ব্বিষহ আর এক নূতন ভার মাথায় লইয়া, সংসারের কাঁটাবনে "সুখ-ক্লিষ্ট" মনে, পাদ-চারণ করিতে আরম্ভ করিলে।

এই অবস্থা নিতান্তই বাঞ্ছনীয় কি? বাঞ্ছনীয় না হইলে সকলেই ঐ প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া জীবননির্ব্বাহের উপায় দেখিতেছে কেন? এবং যেখানে প্রীতির প্রবাহ কিংবা জীবনযাত্রার সাধারণ কি অসাধারণ নির্ব্বাহ, এই দুইয়ের একও সম্ভবপর নহে, সেখানেও পরকীয় পদ-সংবাহ-সুখে আত্মসমর্পণ করিয়া আত্মাবমাননা করিতেছে কি জন্য? কিন্তু তথাপি কেন জানি না, এই প্রবাহ অথবা নির্ব্বাহ ইহার কিছুতেই আমার চিত্তের স্ফূর্ত্তি হয় না। জ্ঞানানন্দ যেমন তাঁহার প্রলাপে বলিয়াছেন যে, তিনি কখনই বিবাহ করিবেন না, আজি ব্যাকরণের বিজ্ঞানসূত্র সম্মুখে লইয়া আমিও সেই কথাই প্রকারান্তরে বলিতেছি,—আমি বিবাহ করিব না। আমার মুখ্য ভয় ঐ সংবাহে। আমি কোন মতেই কাহারও বাহন হইতে রাজি নহি। অনেকে আপনি কাহারও বাহন না হইয়া অন্যকে আপনার বাহন বানাইতে পারিলে বড়ই সুখী হইয়া থাকে। কিন্তু এ নীতির নাম কাল-কূট কণিক-

নীতি। ইহা অধিকতর দোষাবহ। ইহা স্বভাবতঃই পর-পেষিণী, পর-ঘাতিনী। ইহা অন্যের সুখ, স্বত্ব ও স্বাধীন-স্ফূর্ত্তির উপর দিয়া, পর্ব্বত-ভ্রষ্ট শিলাখণ্ডের ন্যায়, ভাঙ্গিয়া চূরিয়া, গড়াইয়া পড়িয়া, চলিয়া যায়; পরের ভাবনা ভাবিবার অবকাশ পায় না। অবকাশ পাইলেও ইহা পরের ভাবনা ভাবে না, পরের পোড়ায় পোড়ে না, পরের দুঃখে দ্রবে না। আমার অমৃত-পিপাসু প্রাণ এই রূপ বিষাক্ত ও বিদ্বিষ্ট বিধির পক্ষপাতী নহে। আমি আপনি অন্যের বাহন হইতে যত না অসম্মত, অন্যকে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনসম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ভাবের বাহন বানাইতে তদপেক্ষা শত সহস্রগুণ বেশী বিরক্ত। সুতরাং বিবাহ ও বিবাহের ব্যাকরণ আমার জন্য নহে। আমি ব্যাকরণের টীকাকার। আমি আজিও যেমন একা আছি, চিরদিনই এমনই একা রহিব।—এবং একা থাকিয়া, এই ভাবে, এই ভবের হাটে, ব্যাকরণাদি বিবিধ শাস্ত্রের টীকা লিখিব।

ঘোমটা।

এ দেশে ঘোমটার ব্যবহার কত কাল অবধি ? ইতিহাসে এই জিজ্ঞাসার সদুত্তর নাই। অনেকেরই এই রূপ ধারণা যে, হিন্দুর সুখ-স্বাধীনতার সময়ে হিন্দু মহিলাদিগের মধ্যে ঘোমটার প্রচলন ছিল না ;—যে অবধি ভারতে যবনের অত্যাচার, ভারত-ললনার মঞ্জু মুগ্ধ মুখমণ্ডলেও সেই অবধিই ঘোমটার আবরণ।

এ কথা অংশতঃ সত্য হইলেও আমার নিকট সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত বোধ হয় না। ভারতবর্ষে পূর্ব্বেও যদি কোন না কোন রূপ ঘোমটার ব্যবহার না থাকিবে, তবে অবগুণ্ঠন ও অবগুণ্ঠিকা প্রভৃতি শব্দ আসিল কোথা হইতে ? বিক্রমাদিত্যের, সমসাময়িক সাহিত্যে ইহার ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, ব্যাসের মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে, এবং অনুসন্ধান করিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থাদিতেও যে ইহা দৃষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ; ইহাও অবধারিত যে, এখনকার ঘোমটা আর তখনকার অবগুণ্ঠন এক রূপ কিংবা একই বস্তু নহে। এখনকার কুল-কামিনীরা কোন কোন স্থলে সূর্য্য চন্দ্র,

তরু লতা এবং পিঞ্জর-রুদ্ধা বিহঙ্গীর নিকটও ঘোমটা দিয়া থাকেন; তখনকার কুল-কামিনীরা অপরিচিত সভাস্থল ভিন্ন প্রায়শঃ কোন স্থলেই মুখে অবগুণ্ঠন দিতেন না, এবং যাঁহাদিগের সহিত স্নেহ মমতার কোন রূপ সম্পর্ক কিংবা ভাল পরিচয় থাকিত, তাঁহাদিগের নিকট কখনও অবগুণ্ঠন দিয়া, শারদীয় উৎসবের অবগুণ্ঠনাবৃতা কদলী-বধূর ন্যায় দণ্ডায়মান হইতেন না। তাঁহারা শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনদিগের নিকট কন্যার ন্যায় থাকিতেন, দেবর ও ননান্দৃ প্রভৃতি স্বসম্পর্কিত প্রিয় ব্যক্তিদিগকে ভ্রাতা ও ভগিনীর মত জানিতেন, এবং কি প্রতিবেশী, কি পৌরবর্গ, কি দূরাগত পূজ্য অতিথি, কি অভ্যর্থিত সাধু সজ্জন, সকলের নিকটই নিরবগুণ্ঠন কথোপকথন ও নির্ম্মুক্ত বিচরণে অধিকার পাইতেন।

কালিদাসের শকুন্তলা, দুষ্মন্তের জন-কোলাহল-পূর্ণ অদৃষ্টপূর্ব্ব রাজসভায় আসিয়া অবগুণ্ঠন * ব্যবহার করিয়া-

---

* যথা বঙ্গানুবাদ—অভিজ্ঞান শকুন্তলে,—

"রাজা। কে সুন্দরী ঋষিদের মাঝে, অবগুণ্ঠে
আবরি বদন? পাণ্ডুপত্র অন্তরালে
স্নিগ্ধরুচি কিসলয় যেন!
প্রতিহারী। চিনিতে না
পারি প্রভু! ভাবে বুঝি পরম সুন্দরী।

ছিলেন সত্য; কিন্তু সেই দুষ্মন্ত যখন তাঁহার পিতার তপোবনে প্রথম উপনীত হন, তখন তিনি এবং তাঁহার সহচরীরা দুষ্মন্তের সমুচিত আদর ও সৎকার করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুন্ঠিত হন নাই। ভবভূতির জনকতনয়া, পাদপকণ্ঠলগ্ন পুষ্পিত ব্রততীর ন্যায়, রঘুকুলপতির কণ্ঠলগ্ন রহিয়াও, রাজদূত, রাজর্ষি এবং দেবর লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ রাজপুরুষদিগের সহিত স্বচ্ছন্দ আলাপ করিয়াছেন। ইন্দুমতী, ফুল্লারবিন্দ-সরোবর-সদৃশী স্বয়ংবরসভায়, প্রফুল্ল রাজহংসীর ন্যায় লীলা করিয়াও, অনিন্দিত রহিয়াছেন। দময়ন্তী দেব-প্রেরিত নিষধ-নাথের নিকট অম্লানবদনে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার প্রত্যেক কথার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। পাঞ্চালী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভৃতি তেজঃপুঞ্জ তাপসদিগের সান্নিধ্যেও রাজনীতির নানা কথা লইয়া বাদবিতর্ক করিয়াছেন, এবং পুর-নারীরা পূজার্হ ব্যক্তিমাত্রের দিকেই মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিয়াছেন।

যাহা হউক, সে অতীত কাহিনীর আলোচনা করা, আমার এইক্ষণকার অভিপ্রেত নহে। ভারতললনার বর্ত্তমান ঘোমটা যবনাচারের অনুকরণ, কিংবা যবন রাজাদিগের অত্যাচারেরই ফলস্বরূপ হউক, অথবা ইহা

ভারতসমাজের ক্রমিক অধঃপাত হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকুক, ইহাকে এখনও যত্নের সহিত রক্ষা করা উচিত কি না, ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের পূজ্য ও অপূজ্য, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, অনেকেই হয়ত এই প্রশ্ন শুনিয়া যুগপৎ জ্বলিয়া উঠিবেন, এবং বিবিধ গ্রীবাভঙ্গি সহকারে সমস্বরে বলিবেন যে, কুলের কামিনী ঘোমটা দিবে কি না, এ বিষয়ে বান্ধবের একজন সহযোগী পণ্ডিতের ব্যবস্থা লওয়ার আবশ্যকতা নাই। আমি বলি, আবশ্যকতা আছে। আদৌ ঘোমটা কেন, তাহারই বিচার কর।

ঘোমটা কি হিন্দু-ধর্ম্ম-নীতির বিশুদ্ধতা ও পৌরাণিক গৌরব রক্ষার জন্য? এ কথায় আমার মনে বড় দুঃখ হয়, এবং দুঃখের সঙ্গে হাসি আসে। হিন্দুধর্ম্ম কি? যে হিন্দুধর্ম্ম পূর্ব্বে আর্য্যজাতির মুকুটমণিস্বরূপ মহানুভাব আচার্য্যদিগের জ্ঞানোজ্জ্বল ভক্তির অমল জ্যোতিতে সমস্ত জগৎকে আলোক দান করিত,—ভগবৎপদাশ্রিত ক্ষত্রবীরদিগের সগর্ব্ব পদ-বিক্ষেপে পৃথিবীকে কম্পিত রাখিত, —যে হিন্দুধর্ম্ম এক দিন সভ্যতার শিরোরত্ন রূপে শোভা পাইত, এবং যোগে ও ভোগে সদাচারের প্রবর্ত্তনা করিয়া,—সমাজে সর্ব্বপ্রকার সুখময়ী সুনীতির পথ দেখা-

ইয়া, এবং সামাজিকতায় ও জীবনের সমস্ত কার্য্যে পৃথ্বী-দুর্ল্লভ পরার্থা প্রীতির সুধা ঢালিয়া, প্রকৃত সৌর-কান্তিতে বিলসিত রহিত, সেই হিন্দুধর্ম্ম কি আজ ব্রহ্মাণ্ডের সকল ছাড়িয়া এবং প্রাচীনা কীর্ত্তির সকল লীলায় জলাঞ্জলি দিয়া হিন্দু-কুল-ললনার ঘোমটায় গিয়া লুক্কায়িত রহিয়াছে? তবে কি ঘোমটা লজ্জার অনু-রোধে? ইহাও আমি মানিতে পারি না।

প্রচলিত লজ্জার প্রকার ও প্রতিকৃতি অনেক এবং উহা এক বিচিত্র বস্তু। আমি বহু চিন্তা করিয়াও উহার অনন্ত চাতুরীর অন্ত পাই নাই, এবং কোন দিনও যে পাইব আমার মনে এমন আশা নাই। ফলতঃ, কিসে লজ্জা যায়, আর কিসে লজ্জা থাকে, তাহা মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারও বুদ্ধির অগম্য। বিলাতের বিবি-দিগের মধ্যে অনেকেই অর্দ্ধবসনা হইয়া অজ্ঞাত-চরিত্র পুরুষের সহিত প্রকাশ্যস্থলে তালে তালে নাচিতে গাইতে পারেন, পূর্ব্বরাগের পুষ্পিত ছলনায় যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে এবং যাঁহার সহিত ইচ্ছা তাঁহার সহিতই প্রণয়ের খেলা খেলিতে পারেন, এবং অশ্বারূঢ়া উগ্রচণ্ডার মত, অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ়া হইয়া, পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনা-য়াসে প্রধাবিত হইতে পারেন। ইহার কিছুতেই তাঁহা-

দিগের লজ্জা বিনষ্ট হইয়া যায় না। কিন্তু তাঁহারা, অতি উৎকট পীড়ার অনুরোধেও, পরের কাছে চরণতলের আবরণ ক্ষণকালের তরে উন্মোচন করিতে বাধ্য হইলে, অথবা দৈবদোষে, এ দেশে আসিয়া, পরের অধরে তাম্বুল-রাগের রেখামাত্র দেখিলে, লজ্জায় একবারে মরিয়া যান।

আমাদিগের মধ্যেও লজ্জার এই রূপ রস-বৈচিত্র্য এবং সর্ব্বত্রই সেই বিচিত্রতার অসংখ্য উদাহরণ সর্ব্বদা লোকের চক্ষে ঠেকে। যথা, সুধীরবাবুর ছোট শ্বাশুড়ী বড় লজ্জা-শীলা। সকলেই বলে, তিনি লজ্জার শাসনে জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ সহোদরেরও মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে সমর্থ হন না, এবং তাঁহার স্বামীর সহিতও কোন দিন মুখ তুলিয়া কথা কহিয়াছেন কি না, তাহা কেহ জানে না। কুলের কামিনী নির্ল্লজ্জা হইলে তাঁহার মনে এমনই ঘৃণা ও 'হ্রী যন্ত্রণা' উপস্থিত হয় যে, যদি তাঁহার পুত্রবধূটি, সীমন্তে সিন্দূর দেওয়ার অভিলাষে, দর্পণের সম্মুখেও মুখের ঘোমটা ফেলিয়া বসে, তাহা হইলেই তিনি শিরে শতবার করাঘাত করেন, এবং কলির পাপাচারে আর লেখা পড়ার পাপময় অত্যাচারে পৃথিবীর লজ্জা সঙ্কোচ যে একবারে প্রক্ষালিত হইয়া গেল, ইহা চিন্তা করিয়া অতি গদ্গদ কণ্ঠে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে

থাকেন। কিন্তু এ দিকে পাঁচ জনের মধ্যে অন্ন ব্যঞ্জনাদি পরিবেশনের সময় শান্তিপুরের দিগম্বরী পরিয়া বাহির হইতে তাঁহার কষ্ট বোধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাতে শরীরে ও মনে তখন তাঁহার আর আনন্দ ধরে না; গৃহের ভৃত্যাদির উপর ক্রোধান্ধ পুরুষের মত অতি কঠোর কণ্ঠে তাড়না ও তর্জ্জন করিতেও তাঁহার জিহ্বা কখনও একটুকু বাধে না. এবং খিড়কীর ঘাটে কিংবা শয়নগৃহের সন্নিকটে পাড়ার স্ত্রী পুরুষ যুটাইয়া হাট মিলাইয়া বসিতে,—এই আধো বৃদ্ধবয়সেও বাসরগৃহের বিলাসিনী সাজিতে, —কৌতুকপ্রসঙ্গে কথার ছড়া কাটিতে, অথবা বাসিবিবাহের কাদাখেলা লইয়া, কমলকাননে করিণীর ন্যায় প্রমত্ত ক্রীড়া করিতে, তাঁহার চিত্ত কখনও কোন রূপ কাতরতা অনুভব করে না! বাড়ির বহিঃপ্রাঙ্গণে যখন কবিওয়ালার সেই নয়নহারি কপি-নৃত্য হয়, তখন তাঁহার কৌতূহল সকলের উপরে। তিনি তখন সমবয়স্কাদিগকে লইয়া সখ করিয়া সখীসংবাদ শুনেন, এবং যখন লহরের আরম্ভ হয়, তখন তিনি তিরস্করণীর অন্তরালে চাতকীর ন্যায় তৃষিতচিত্তে উপবিষ্টা রহেন!

বিন্ধ্যবালার বড় পিসীও নিতান্ত লজ্জাবতী। তিনি

কিঞ্চিৎ পরিমাণে সেকেলে লোক। এখনকার কুৎসিত রীতি নীতি তাঁহার চক্ষে বিষ। ঘরের ঝি বউয়ের ত কথাই নাই, পাড়া প্রতিবেশীর মেয়েরাও তাঁহার ভয়ে সতত জড় সড় রহে। তিনি সর্ব্বদাই সকলকে লজ্জার কথা লইয়া নানা দৃষ্টান্তে উপদেশ দেন ও শাসন করেন; এবং অতি ঘনিষ্ঠ কোন প্রাচীন প্রতিবেশীও যদি কার্য্যানুরোধে তাঁহার নিকটে আসেন, তিনি তৎক্ষণাৎই আজানুবিলম্বিত ঘোমটা টানিয়া সহর্ষ-কম্পিত স্ফুরিত কলেবরে এক পার্শ্বে সরিয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার শরীরে কামিনী-সুলভ ক্রোধ একটুকু অধিক। ঐ রূপ ক্রোধ যে নিন্দনীয়, এমন কথা বলিতে আমি সাহস পাইতেছি না। আমার কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে, তাঁহার হৃদয় সময়ে সময়েই ক্রোধে ঈষৎ কম্পিত হয়। তিনি যখনই সেই কমনীয় অথচ ক্ষণস্থায়ী ক্রোধের ক্ষণিক উত্তেজনায় বাড়ির ভিতর হুঙ্কার দেন, বহির্বাটীর প্রাচীর চত্বরও তখন থর থর কাঁপিয়া উঠে, এবং গ্রাম্য পাঠশালার অনেক গজকণ্ঠ পণ্ডিত এবং দুর্ব্বার বালকবৃন্দও তখন ক্ষণকালের জন্য চিত্রার্পিতবৎ স্তম্ভিত রহে। কেহ "পার্য্যমাণে" * তাঁহার

* পার্য্যমাণে এই শব্দটি সংস্কৃতমূলক নহে; কিন্তু ইহা বিদ্যমান

সহিত বিবাদ বাধাইতে যায় না। কারণ সকলেই সংসারে সন্তান সন্ততি লইয়া সুখে বাস করিতে ইচ্ছা করে। তথাপি, যদি দৈবাৎ ও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সহিত সত্য সত্যই কাহারও বিবাদ বাধিয়া উঠে, তবে তাহারই এক দিন, কিংবা তাঁহারই এক দিন। তিনি তখন একে একসহস্র এবং মূর্ত্তিমতী মহিষাসুররূপিণী। তাঁহার আলুলায়িত কেশকলাপ তখন ঝঞ্ঝা-বায়ু-বিতাড়িত বিক্ষিপ্ত কাদম্বিনীর কম-কান্তি ধারণ করে, চক্ষে আগ্নেয় গিরির অভিনয় হয়, অঞ্চলের বস্ত্র কটিবন্ধনে পরিণতি পায়, বাহুবল্লরী নাবিকের ক্ষেপণীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে, চরণদ্বয় শস্যনিষ্পেষণদণ্ডের শক্তি ও মহিমা কাড়িয়া লয়, এবং ফেনায়মান বদনারবিন্দ তটিনীর ফেন-সমাচ্ছন্ন শ্বেত পুলিনকেও বারংবার ধিক্কার দেয়। এ সকল কিছুতেই তাঁহার লজ্জার ব্যাঘাত হয় না, এবং অন্যকে লজ্জাহীনা বলিয়া তিরস্কার করিবার বংশানুক্রমিক কায়েমি অধিকারও ইহাতে কোন ক্রমেই কমে না।

ও দৃশ্যমান প্রভৃতি শব্দের ন্যায় সংস্কৃতের অনুকরণে—সংস্কৃত ছাঁদে গঠিত, এবং বঙ্গের সর্ব্বত্রই সমান প্রচলিত।

কবি ও দার্শনিকেরা যাহারে লজ্জা বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহা আর এক সামগ্রী। তাহা বস্তুতঃই অবলার অমূল্য আভরণ, এবং আভরণ অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান্ ও প্রীতিপ্রদ, মনোহর আবরণ। তাহা অবলার মুখচ্ছবিকে অতি মনোহর একখানি ছায়ার ন্যায় ঢাকিয়া রাখে; দৃষ্টির তীব্রতা ও চাঞ্চল্য বিনাশ করে, অথচ দৃষ্টিতে কেমন এক অপূর্ব্ব মাধুরী আনিয়া মাখিয়া দেয়;—কথার কঠোরতাকে কোমলতায় দ্রবীভূত করায়, এবং ক্রমশঃ বিকসিত, ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া, পবিত্রতারই আর এক মূর্ত্তির মত অঙ্গে একবারে মিশিয়া যায়। সেই লজ্জা কি এই? যদি লজ্জার জন্যই ঘোমটার আবরণ, তাহা হইলে অণুবীক্ষণেরও অদৃশ্য, ঊর্ণনাভসূত্রের পরিচ্ছদ কেন? শরীরের যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আভরণের ছটায় প্রদর্শন করিতে পণ্যবিলাসিনীরও লজ্জিত হওয়া উচিত, সে সকল অঙ্গে আভরণ কেন? যে মৃদু মধুর মোহন হাস্য অবলার বিম্বাধরে কুসুমের অস্ফুট বিকাশের ন্যায় সুন্দর দেখায়,তাহার পরিবর্ত্তে এই অট্টহাস্যের আতঙ্কজনক হিল্লোল কেন? আর, পুরুষের পরাভবযোগ্য শ্লেষপরিহাস,—পুরুষেরও অবশ্যপরিহার্য্য অসঙ্গত আমোদপ্রমোদ লইয়া উৎসাহ ও আনন্দ, এবং যেখানে

সেখানে উল্লিখিতরূপ বিরোধের ঘনঘটা ও ভয়ঙ্কর বজ্র-গর্জ্জন কেন?

এইক্ষণকার প্রচলিত ঘোমটা অবলার লজ্জারক্ষার সহায় হওয়া দূরে থাকুক, আমার বিবেচনায় লজ্জার অমন ছদ্মবেশ ও ছল-বিলাসী শত্রু অল্প আছে। যাঁহারা এ কথার গূঢ়ভাব গ্রহণে অসমর্থ, তাঁহারা, লোকাচারের পঙ্কিল পরিণামে, মানবপ্রকৃতির মর্ম্মার্থ পাঠ করিতে যত্নপর হইবেন; এবং য়িহুদীদিগের পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের যে এক অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ কাহিনী আছে, তাহারও তাৎপর্য্য পরিগ্রহে চেষ্টা করিবেন। এ দেশে ঘোমটাই সেই নিষিদ্ধ ফল, সেই রহস্যের রহস্য; এবং নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আজও ইহা আর্য্য-সমাজ বলিয়া পরিচিত চিরপবিত্র হিন্দুসমাজের একার্দ্ধকে কুলকালিমার মত ঢাকিয়া রাখিতে অধিকার পাইতেছে!

আমরা অনেক সময়ে অনেক শুদ্ধচারিণী পুর-কামিনীর চক্ষেও কেমন এক চটুলতা, হৃদয়ে কেমন এক তরল-তরঙ্গ এবং মনে কেমন এক কৌতূহলের আকুলতা দেখিয়া, অধোবদন হইয়া রহি। প্রকৃত প্রস্তাবে ঘোমটার কৃত্রিম আবরণই এ সকল কৃত্রিম বিভ্রমবিলাস ও কৃত্রিম লীলা-

চাতুরীর প্রধান কারণ।* চক্ষুর স্বাভাবিক লালসা লোক-নিগ্রহে নিরুদ্ধ হয়; এবং নিরুদ্ধ হইয়া, অস্বাভাবিক বর্ত্মে বিচরণ করে। হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবাহ গতিপথে বাধা পায়; এবং বাধা পাইয়া অস্বাভাবিক গর্হিত পথে গড়াইয়া পড়ে। মনের অনিবার্য্য জ্ঞানতৃষ্ণা স্বাভাবিক আনন্দে বঞ্চিত হয়; এবং বঞ্চিত হইয়া অস্বাভাবিক আনন্দে তৃপ্তির অন্বেষণ করিতে থাকে। আমরা অনেক স্থলে আবার অনেক সাধুব্রত্ত যুবজনের মধ্যেও পুরসুন্দরী-দিগের প্রচ্ছন্ন রূপরাশি দেখিবার মতি ও প্রবৃত্তির পরিচয় পাইয়া ব্যথিত হই। একটুকু চিন্তা করিলেই প্রতীত

* যিনি অবলার চিত্র ও চরিত্র প্রদর্শনে এ দেশের সর্ব্বত্রই অসা-ধারণ নিপুণ বলিয়া আদরের অতি উচ্চ আসন পাইয়াছেন, উল্লিখিত প্রসঙ্গে, তিনিও তাঁহার পরিণত বার্দ্ধক্যে, ইন্দিরার মুখে, নিম্নোক্ত প্রকার সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন।—

"আমি অবগুণ্ঠনবতী, কিন্তু ঘোমটায় স্ত্রীলোকের স্বভাব ঢাকা পড়ে না। ঘোমটার ভিতর হইতে একবার নিমন্ত্রিত বাবুটিকে দেখিয়া লইলাম।"

পুনশ্চ,—

"পুরুষে বলিয়া থাকেন যে, অন্ধকারে প্রদীপের মত, অবগুণ্ঠন মধ্যে রমণীর কটাক্ষ অধিকতর তীব্র দেখায়।"

হইবে যে, ঐ ঘোমটাই তাহার মূল। অবলার সুমার্জ্জিত রুচি, সুশিক্ষিত ও শাসন-ক্ষম চক্ষু, সামাজিক পবিত্রতার অদ্বিতীয় সুহৃৎ। যাহারা কিছুতেই লজ্জা পায় না, কিছুতেই আচারগত উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে নিবৃত্ত হয় না, এবং কিছুতেই আপনাদিগের অসভ্যতা ও অবজ্ঞাজনক ইতরতা অনুভব করিয়া সঙ্কুচিত হইতে শিখে না, অবলার অমৃতাভিষিক্ত পবিত্র দৃষ্টি তাহাদিগকেও তীব্র কশাঘাতের ন্যায় শাসন করে। ঘোমটা আমাদিগের সমাজকে সেই প্রার্থনীয় শাসনে বঞ্চিত রাখিয়াছে, এবং কতকগুলি কুকবি, কুরসিক ও সরস্বতীর চিরবিদ্বেষী কুৎসিতচরিত্র নব্য সৌখীনের কাব্যালাপ, কৌতুকরঙ্গ এবং কথকতার এক ক্রীড়াস্থল হইয়া রহিয়াছে।

অপিচ, ঘোমটা এক অপ্রাকৃত দৃশ্য, পুরুষের নির্ল্লজ্জতা ও নিষ্ঠুরতার এক আশ্চর্য্য নিদর্শন। মনুষ্যের চক্ষু এই জগতের সৌন্দর্য্যসাগরে সন্তরণ করিবার জন্য, বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিবার জন্য নহে। ঐ দেখ, শরতের চন্দ্র তোমার নয়নপথের পথিক হইবার জন্য মেঘের অন্তরালে কতই কি খেলিতেছে, আর হাসিতেছে। ঐ দেখ, মৃদুলদুলিত মাধবী লতা, তোমার চক্ষু দুটির সহিত প্রণয়ের আলাপ করিবার জন্য কিরূপ দুলিয়া দুলিয়া পড়িতেছে,

ও কর-সঙ্কেত করিতেছে। ঐ দেখ, তুষার-ধবল ধবল-গিরির অভ্রভেদী শৃঙ্গ, তরুণ সূর্য্যের কনক-কান্তিতে বিলসিত হইয়া, ক্ষণে ক্ষণে কতই শোভা ফলাইতেছে, এবং উহার সে অপরূপ অথবা অনির্ব্বচনীয় ঝল ঝল সৌন্দর্য্য তোমার চক্ষু ও কল্পনা উভয়ের উপর কি রূপ কার্য্য করিতেছে,—উভয়কেই পৃথিবীর ধূলিকর্দ্দম হইতে কত ঊর্দ্ধে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। প্রকৃতির সহিত এই রূপ কথোপকথনই কাব্যের প্রকৃত অমৃত,এবং কাব্যের অমৃতপানেই হৃদয়ের উন্নতি ও বিকাশ। অবলার কি চক্ষু নাই? যদি থাকে, তাহা হইলে সে চক্ষু কি এই অনন্ত বিশ্ব-সংসারে শুধু তোমার ঐ ভ্রূকুটি-কুটিল মুখখানি দেখিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল? বস্তুতঃ,ঘোমটা অবলার চক্ষুকে বস্ত্রে আবৃত রাখিয়া, প্রকৃতির বিড়ম্বনা করে, অবলাহৃদয়ের উন্নতি ও বিকাশের পথে ভয়ানক অন্তরায় হয়, এবং যিনি প্রকৃতির প্রাণ-দেবতা ও পবিত্রতার প্রস্রবণ, তাঁহার কর-লেখায়ও অপবিত্রতার অপবাদ দেয়। যেখানে বাহিরে অবলার সম্মানরক্ষার সম্ভাবনা নাই, অবলা সেখানে অন্তঃপুরেই অবস্থান করুক। অবলার সলাজ-মধুর চকিত চক্ষু যাহাদিগের চক্ষুর সন্নিহিত হইলেই ভয়ে উদ্বেজিত কিংবা ঘৃণায় সংকুচিত হয়, অবলা তাদৃশ ব্যাধ কিংবা

বিষ-সর্পের বিষ-দৃষ্টি পরিহার করিয়া চলুক। কিন্তু, তাই বলিয়া কি অবলা অন্তঃপুরের সুরক্ষিত শান্তিনিকেতনেও আপনাকে আপনি ঘোমটায় ঢাকিয়া কৃত্তিবাসী ভস্মলোচনের কনিষ্ঠা ভগিনী সাজিবে? দেশের লোক সুনীতি ও সুরুচির সম্মান করিতে জানে না বলিয়া কি শুধু অবলাই তাহার দণ্ড, নিগ্রহ ও শাস্তি ভোগ করিবে?

সম্পাদকের মন্তব্য।

পরিব্রাজক কল্যাণভট্ট আমাদিগের পুরাতন বন্ধু। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, আমরা কোন দিনও তাঁহার সকল কথায় হৃদয়ের সহিত সায় দিতে সমর্থ হই নাই। ভট্টপ্রবর, পৌরাণিক সম্প্রদায়ের লোক হইয়াও, পরিবর্ত্তে অনুরাগী ও প্রমোদ-প্রিয়। তিনি যাহা লিখেন, তাহার কোন্ কথা তাঁহার অন্তরের কথা,—কোন্ কথায় তাঁহার প্রকৃত ব্যথা, তাহা আমরা সকল সময়ে সম্যক্ পরিগ্রহ করিতে পারি না।

কল্যাণভট্ট কিংবা তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহই কখনও বিলাত যান নাই। সুতরাং বিলাতী ললনাদিগের পূর্ব্বরাগ, প্রণয়খেলা এবং নৃত্য গীত প্রভৃতি ক্রীড়া প্রসঙ্গে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা শুনা কথা।

শুনা কথার উপর তর্ক বিতর্ক, এবং বিচারমল্লতা ও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত আমাদিগের নিকট ভাল লাগে না; এবং শুনা কথার উপর ভর করিয়া জাতিবিশেষের কুল-কামিনী-দিগকে প্রকারান্তরে লজ্জাহীনা বলিয়া বিদ্রূপ করা আমাদিগের নিকট সঙ্গত জ্ঞান হয় না।

বিলাতে নৃত্যাদির যে রূপ প্রচলন আছে, তাহা কোন কোন অংশে নিতান্তই জঘন্য। যাঁহারা "ভুক্ত-ভোগী" তাঁহারা স্বয়ংই ইহা স্বীকার করেন। তাঁহা-দিগের স্বহস্তচিত্রিত কাব্য নাটকাদিতেও সে নৃত্যের যে রূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে স্বভাবতঃই মনুষ্যের বিরক্তি জন্মিতে পারে। নৃত্যের পরিণামফলও সময়-বিশেষে সর্ব্বনাশেরই প্রশস্ত সোপান। কিন্তু বিলাতে প্রণয়িদিগের মধ্যে পরিণয়ের পূর্ব্বে পরস্পরের যে রূপ উপাসনা হইয়া থাকে, সেই পূর্ব্বরাগের আনন্দময় অভি-নয়কেও সকল স্থলে এবং সকল অংশেই নৃত্যের মত জঘন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে আমাদিগের সাহস জন্মে না। কবি কহিয়াছেন,—যথা কুমারসম্ভবে,—

ইয়েষ সা কর্ত্তুমবন্ধ্যরূপতাং
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ

অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং
তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ।

অর্থাৎ,

রূপের সাফল্য সিদ্ধি লভিবার মনে,
সংকল্প করিলা সতী তপস্যাসাধন,
বিনা তপে, কার কবে, ঘটে এ ভুবনে
অইরূপ প্রেম আর পতিও অমন।

ইহাতে দেখা যায় যে, পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রণয়ের সাধনা আর্য্যজাতির পুণ্যময়ী কল্পনারও আরাধ্য বস্তু ছিল। তবে সে সাধনায় আর এখনকার সাধনায় পার্থক্য বড় বেশী।

দ্বিতীয়তঃ, ভট্ট মহাশয় অকৃতদার ব্যক্তি। অকৃতদার ব্যক্তি অবলার লজ্জা, সঙ্কোচ ও 'স্ত্রী যন্ত্রণা' বিষয়ে অভিজ্ঞের মত কথা কহিতে পারে কি না, সে বিষয়েও আমাদিগের কিঞ্চিৎ সংশয় আছে। তবে ইহা আমরা সাধারণতঃ অক্ষুব্ধচিত্তে বলিতে পারি যে, হিন্দুসমাজে হিন্দুর পুরাতন বিশুদ্ধ রীতি নীতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হউক, ইহা আমাদিগেরও ঐকান্তিক কামনা;—আর, এ দেশে ঘোমটা এইক্ষণ যে রূপ মূর্ত্তি লাভ করিয়া যে ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বতন বৈদিক কিংবা পৌরাণিক

হিন্দুর প্রীতিসম্মত কি না, ইহা আমাদিগের বিবেচনায়ও আলোচনার যোগ্য কথা। ইহা সত্য যে, পুর-ললনার ঘোমটাঢাকা মুখখানি কিয়দংশে নিষিদ্ধ ফলের লক্ষণা-ক্রান্ত। কিন্তু নিষিদ্ধ ফল মাত্রই কি জীবের নিরতিশয় স্পৃহণীয়। তাহা হইলে লজ্জার আর স্বাভাবিকতা অথবা সার্থকতা থাকে কিসে? মনুষ্যের দয়া ধর্ম্ম এবং প্রেম প্রভৃতি পবিত্র ভাবনিচয় যেমন যুগ-যুগান্তব্যাপী ক্রম-বিকাশের পরিণাম, অবলার লজ্জাও সেইরূপ অসংখ্য যুগ-ব্যাপী আচার অনুষ্ঠানের অবশ্যম্ভাবী ফল। ভট্ট মহাশয়ও ইহা স্বীকার করেন যে, লজ্জাই অবলার প্রকৃত আবরণ, প্রকৃতিসিদ্ধ আভরণ। সে লজ্জাকে যদি কোন কারণেও বিঘ্নিত হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে অবলাস্বভাবের অমল-মাধুর্য্য কি অবলম্বন করিয়া বিকসিত হইবে? অপিচ, হিন্দু ভিন্ন পৃথিবীর অন্য অন্য জাতির মধ্যেও অব-গুণ্ঠন-ব্যবহার নানাবিধ প্রথায় প্রচলিত আছে। ইহাতে কি অবগুণ্ঠনের সহিত অবলাজনোচিত লজ্জার একটুকু স্বাভাবিক সম্বন্ধই সূচিত হয় না? যাহা হউক, কথাটা গুরুতর। কথাটা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বাদ প্রতিবাদ এবং তর্ক বিতর্ক হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়।

মুখরা ভার্য্যা।

অথবা

গৃহিণী রোগ।*

প্রিয় বান্ধব, §

আপনার আর কোন গুণ থাকুক আর না থাকুক, নামটি বড় মধুর। আমি ঐ নামটি শুনিয়াই আপনাকে এক জন সহৃদয় লোক বলিয়া ঠাউরাইয়া রাখিয়াছি, এবং মন খুলিয়া মনের একটি নিগূঢ় বেদনা আপনার কাছে আজ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। যদি আপনার হৃদয় ও মন প্রকৃত প্রস্তাবে আপনার নামের অনুরূপ হয়, তবে দয়া করিয়া উপদেশচ্ছলে আমায় দুটি কথা বলিয়া বাধিত করিবেন। আপনার চক্ষু পরের দুঃখে কখনও আর্দ্র হয় কি ?

---

* আয়ুর্ব্বেদে "গ্রহণী" রোগের বর্ণনা আছে, "গৃহিণী" রোগের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং, পাঠক অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, এই দুই রোগ এক লক্ষণাক্রান্ত নহে।

§ এই পত্রখানি বান্ধব নামক সাহিত্যপত্রের সম্পাদককে সম্বোধন করিয়া লিখিত হইয়াছিল।

আদরের ধন কাহাকে বলে, তাহা অবশ্যই আপনি জানেন। আমি শৈশবে সত্য সত্যই আমার পিতা মাতার বড় বেশী আদরের ধন ছিলাম। আমি যখন যাহা চাহিতাম, অতি দুর্ল্লভ বস্তু হইলেও তৎক্ষণাৎই তাহা আমার করায়ত্ত দেখিয়া আনন্দে ভাসিতাম। ছেলে বেলায় সকলেই খেলিয়া বেড়ায়। আমি খেলায় একটু বেশী মাতোয়ারা ছিলাম। খেলার ছলে পাড়ার ছেলেদের উপর কখনও কখনও নিতান্ত অসঙ্গত অত্যাচার করিতাম। কিন্তু তাহারা আমার নামে নালিশ করিবার সুযোগ পাইত না। নালিশ করিবে আমার পিতা মাতার কাছে। আমার পিতা মাতা, নালিশের আগেই, তাহাদিগকে মিঠাই মণ্ডা দিয়া, পরিতুষ্ট করিতেন। মনুষ্য, কিবা শৈশবে, কিবা বার্দ্ধক্যে, সকল বয়সেই কোন না কোন রূপ মিঠাই মণ্ডার জন্য, বহু প্রকারের নিগ্রহ সহ্য করিতে প্রস্তুত। কোন কোন ছেলে মিঠাই মণ্ডার লোভে আমাকে পাঁচ কথা কহিয়া একটুকু উত্তেজনা দিত, এবং আমি উত্তেজিত হইয়া অত্যাচার করিলে, সাধ করিয়া তাহা সহিয়া লইত। এখন সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিতেছি যে, অনেক বড় বড় বিষয়ী লোকও, ঠিক এই নীতিরই অনুসরণ করিয়া, সাহেবদিগের কাছে পরিণামে

পুরস্কারের লোভে, প্রথমে পদাঘাত প্রাপ্তিরই সুযোগ অন্বেষণ করেন।

খেলার নেশা না ছুটিতেই আমি আর এক নেশায় ডুবিয়া গেলাম। আমার বিদ্যারম্ভ হইল। আমি ক খ পড়িতে আরম্ভ করিলাম। তখন ক খর পুঁথি, ক খর তাস এবং ক খর নানা প্রকার নূতন নূতন ছবিতে আমার থাকিবার ঘরটি ভরিয়া গেল, এবং আমি ক খ লেখাকেও নূতন এক প্রকার খেলা মনে করিয়া তাহাতে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। পিতৃদেবের সমবয়স্কেরা ইহা দেখিয়াই বলিয়া উঠিল যে, "এ বালক প্রতিভার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।" পিতা তাঁহাদিগের এ কথায় প্রকৃতই যার পর নাই প্রীত হইলেন, এবং আমার উপযুক্ত শিক্ষার জন্য একটি "প্রাইবেট টিয়ুটর" নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

প্রাইবেট টিয়ুটর মাত্রকেই অনেক রকম বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। যিনি অদৃষ্টদোষে আমার প্রাইবেট টিয়ুটর হইলেন, বোধ হয় তাঁহাকে কোন কোন বিশেষ বিষয়ে একটুকু বেশী বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইল। তিনি আমাকে কখনও কোন প্রকারে শাসন করিতে পাইতেন না, সে ত বাহিরের কথা। ইহা ছাড়া ভিতরে আর একটি কথা ছিল। সে কথা লিখিতে এখনও আমার

লজ্জা বোধ হয়। লজ্জার সঙ্গে হৃদয় মাতৃস্নেহের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য অনুভব করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে। মা আমার টিয়ুটর বাবুটিকে এক দিন নানা উপচারে জলযোগ করাইলেন। জলযোগ করাইয়া গোপনে বলিলেন, —"বাছা, তুমি আমার ছেলেকে কোন প্রকারেও কষ্ট দিতে পারিবে না। তাহা হইলে আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। আমার ঐ একটি মাত্র ছেলে। আমি কোন মতেও উহার কোন কষ্ট চক্ষে দেখিতে সমর্থ হইব না। পুঁথিতে যা লেখা থাকে, তুমি বড় গলায় নিজে তাহা পুনঃ পুনঃ পড়িও, ছেলে আমার তা শুনিয়াই সব কথা শিখিতে পাইবে।"

বেচারা টিয়ুটর তাহাতেই সম্মত হইলেন, এবং সে দিন হইতে কিছু কাল সেই ভাবেই আমি কখনও ঘুমাইয়া, কখনও খেলিয়া, কখনও বা অন্যপ্রকারে সময় নষ্ট করিয়া, কানে শুনিয়া ক খ শিখিলাম। যখন ক খ এবং ফলা বানান অতিক্রম করিয়া ইংরেজি ইস্পেলিং ধরিলাম, তখনও ঐ ভাবে,—ঐ রূপ সুখ-সেব্য প্রক্রিয়াতেই আমার "পড়া শুনা" হইতে লাগিল। কিন্তু, তাহাতে প্রায়শঃই বড় একটা বিষম গোল বাধিত। টিয়ুটর কোন শব্দের বর্ণবিন্যাস করিয়া আমায় তাহার

উচ্চারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি প্রায়ই একে আর কহিতাম। যথা, তিনি পড়িতেছেন,—আমি শুনিতেছি,—

A b Ab, s e n t sent, Absent.
এ বি এব্, এস্ ই এন্ টি সেন্ট্, এব্‌সেন্ট্।
C a b Cab, b a g e bage, Cabbage.
সি এ বি ক্যাব্, বি এ জি ই বেজ্, ক্যাবেজ্।

আবার,—

A b Ab, s e n t sent, Absent.
এ বি এব্, এস্ ই এন্ টি সেন্ট, এব্‌সেন্ট্।
C a b Cab, b a g e bage, Cabbage.
সি এ বি ক্যাব্, বি এ জি ই বেজ্, ক্যাবেজ্।

এই রূপ বহু শব্দের বর্ণবিন্যাস আবৃত্তি করিয়া তিনি যখন আমায় জিজ্ঞাসা করিতেন,—বল ত, এ বি এব্—এস্ ই এন্ টি সেন্ট্—কি হইল? আমি তখন নিদ্রালস চক্ষে ও নির্ভয়চিত্তে বলিয়া বসিতাম—ক্যা—বেজ।

টিয়ুটর ইহাতে নিতান্তই দুঃখিত হইতেন। কিন্তু তাঁহার দুঃখে আসে যায় কি? আমার মায়ের কাছে তাঁহার দুঃখ বেশী, না আমার পরিশ্রম ও কষ্টটা বেশী। এ দেশের অনেক ছাত্র এখনও "পড়া শুনা" করে বলিয়া গুরুজনকে জানাইয়া থাকে। পড়া শুনা বিষয়টা কি

তাহা আপনি এখন ভালরূপ বুঝিয়াছেন ত? এক জনে পড়িতেছে, আর এক জনে তাহা শুনিতেছে, এবং কাছে বসিয়া কানে শোনার দরুণ যথাসম্ভব যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিতেছে। ইহারই নাম "পড়া শুনা"।* বোধ হয়, এই রূপ "পড়া শুনা" অদ্যাপি কোন কোন স্থানে প্রচ-

---

* সুর-লোকে ইন্দ্রের বেদাদি শাস্ত্র শিক্ষা সম্বন্ধে সংস্কৃতে এই রূপ একটি উপাখ্যান আছে। ইন্দ্র বিদ্যা শিক্ষা করিবেন। তাঁহার শিক্ষক হইবে কে? দেবতারা সকলে পরামর্শ করিয়া সুর-গুরু বৃহস্পতিকে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু দেবতারা, কিছু দিন পরে, পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ইন্দ্রের কিছুই ব্যুৎপত্তি জন্মিতেছে না। বৃহস্পতির মত ব্যক্তি দিতেছেন পাঠ, আর ছাত্র ইন্দ্র। তথাপি ইন্দ্রের কেন বিদ্যা হইতেছে না, ইহা চিন্তা করিয়া দেবতারা সকলেই অবাক্। ইহার পর দেবতারা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, বৃহস্পতির শিক্ষাপ্রণালীতেই দোষ। তিনি, তাঁহার সেই মহামহিম ছাত্রের মন যোগাইবার জন্য, তাঁহাকে কোন ক্লেশ করিতে না দিয়া, সমস্ত পাঠই স্বয়ং পড়িয়া শুনাইতেন, এবং শব্দার্থ বিষয়ে শিক্ষা না দিয়া মোটামোটি বাক্যের ভাবার্থটা মাত্র বুঝাইয়া দিতেন। দেবতারা, ইহার পর, ইন্দ্রের শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন, এবং ইন্দ্রও পরিশেষে সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া গুরুর নিকট বিদায় লইলেন।

লিত আছে। যাহা হউক আমার সে সুখের "পড়া শুনা" শীঘ্রই বন্ধ হইল। পিতৃদেব যে দিন উহা জানিতে পাইলেন, সে দিন হইতেই পড়া শুনার পরিবর্ত্তে আমার রীতিমত "লেখা পড়া" প্রবর্ত্তিত হইল, এবং আমি দুই তিন বছরের মধ্যেই বালকদিগের প্রথমপাঠ্য পুস্তকগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়া পাড়ার সব বালকের উপর প্রতিষ্ঠা পাইলাম।

যখন আমি একটুকু বড় হইয়া স্কুলে গেলাম, তখন কএকটি বৎসর আমার লেখা পড়া যথার্থই খুব ভাল চলিল, এবং আমার পিতৃদেবের মনস্তুষ্টির জন্য, শিক্ষক মহাশয়েরাও সকলেই সে কথার উল্লেখ করিয়া পঞ্চমুখে আমার প্রশংসা করিলেন। আমি বড় সুবোধ, আমি বড় সুস্থির, আমি বড় আজ্ঞাবহ, আমি বড় বিনীত ও অধ্যয়নরত, এই বই আর তাঁহাদিগের মুখে বাক্য ছিল না। শিক্ষকদিগের অনুকরণে প্রতিবেশীরাও পিতা মহাশয়ের নিকট আমার প্রশংসায় নানা কথা কহিলেন। এই আনন্দে পিতা আত্মহারা হইলেন,—আমার অবোধিনী মাতাও একবারে গলিয়া পড়িলেন; এবং কএক বৎসর অতীত হওয়ার পরই আমার লেখা পড়ার কথা ভুলিয়া গিয়া, কিসে শীঘ্র শীঘ্র আমায় বিবাহ করাইবেন, উভয়ে সর্ব্বদা

তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। যদি আত্মীয়দিগের মধ্যে কেহ সাহস করিয়া নিষেধ করিত, পিতা তাহার প্রতি যার পর নাই বিরক্ত হইতেন, এবং এমন পুত্রকে পুত্রবধূর সহিত একখানে করিয়া উভয়ের চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ না করিলে জীবনে আর প্রয়োজন কি, এই বলিয়া মা তাহাকে প্রবোধ দিতেন।

পিতা আমার বিবাহের নাম লইতে না লইতেই ঘটক ও কুলাচার্য্যগণ চতুর্দ্দিগ হইতে পঙ্গপালের ন্যায় ঝুঁকিয়া পড়িল; আমাদিগের বাড়ির বহিরঙ্গণে,—"নত্বা তাং কুল-দেবতাং"—এই সুমধুর শ্লোক শত-কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে বিবাহযোগ্যা মেয়ের সংখ্যা কিরূপ ভয়ানক বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা আপনার অজ্ঞাত নহে। এ দেশের ইদানীন্তন পুরুষেরা প্রায়ই দৈবদোষে স্ত্রীলোকের মত অলস, অকর্ম্মণ্য, ভীরুস্বভাব, বিলাস-রত ও বিদ্যাবিমুখ। বোধ হয়, ইহা দেখিয়াই বিধাতা বঙ্গে পুরুষের সংখ্যা কমাইয়া, ঘরে ঘরে কন্যাসন্তানের সংখ্যা ত্রিগুণ কি চতুর্গুণ করিয়া বাড়াইতেছেন। কেন না, পুরুষের দ্বারা যখন কিছু হইল না, তখন হয় ত স্ত্রীলোকেরাই পুরুষাচারপ্রিয় ও পৌরুষগুণসম্পন্ন হইয়া, একদিন না একদিন দেশের দুঃখভার মোচন করিতে পারে।

সে যাহা হউক, বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে বিবাহযোগ্য বরের সংখ্যা হইতে বিবাহযোগ্যা পাত্রীর সংখ্যা যে অনেক অধিক, তাহাতে আর কিছুই সন্দেহ নাই। আমার বিবাহ উপলক্ষেও ইহাই সকলের প্রত্যক্ষ হইল। ঘটকেরা অন্যূন পঁচিশটি পাত্রীর প্রসঙ্গ লইয়া আমাদের বাড়ি দিবারাত্রি যাতায়াত করিতে রহিল।

পিতা স্বভাবতঃই একটু অভিমানী ছিলেন। কেন না, তিনি বড় শ্রোত্রিয়, এবং খুব ধনী না হইলেও, বুনেদি বড় মানুষ। পুত্রের মহার্ঘতা দর্শনে তাঁহার অভিমান আরও বাড়িয়া উঠিল, এবং অভিমানের সঙ্গে ফরমায়েষও ক্রমে ক্রমে নিতান্ত উচ্চ হইতে চলিল। দশ জনের ঘরে সাধারণতঃ যেরূপ মেয়ে দেখা যায়, তাহাতে তাঁহার মন অগ্রসর হইল না। তাঁহার পুত্রবধূ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা হইবে, উলের কাজ ও তুলির কাজ প্রভৃতি স্ত্রীজন-সুলভ সুকুমার বিদ্যাচয়ে দীক্ষিতা থাকিবে, এবং বুদ্ধি বিবেচনা ও গৃহস্থালীর সকল গুণে দেশের সকল মেয়েকে পরাজয় করিবে। একাধারে এত গুণ থাকিলে মনঃপূত, নচেৎ অগ্রাহ্য। কিন্তু এরূপ সাগর-সেঁচা সোনার পুতুল অথবা অমূল্য মাণিক্য কয়জনের ঘরে পাওয়া যাইতে পারে? ঘটকেরা শুনিয়া শুনিয়া,

হতাশ হইয়া, পৃষ্ঠভঙ্গ দিল, এবং বিবাহও কাজে কাজেই কিছু দিনের জন্য কথায় রহিল।

আমি নিজে কোন দিনও তেমন একটা সুন্দর ছিলাম না। কিন্তু যখন বিবাহের বর রূপে, আজ ইহার কাছে, কাল উহার কাছে, গ্রীবারজ্জুধৃত লীলামর্কটের ন্যায়, প্রদর্শিত হইতে লাগিলাম, তখন পিতার প্রসাদে এবং প্রিয়ংবদ প্রতিবেশিগণের মুখের গুণে আমিও ভয়ানক (!) সৌন্দর্য্যশালী হইয়া পড়িলাম। আমার লাবণ্যশূন্য অস্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ সকলকে দশরথের দূর্ব্বাদল-শ্যামের কথা স্মরণ করাইল; আমার কোটরস্থিত কুঞ্চিত চক্ষু সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক হইল; শরীরের ক্ষীণতা অধ্যয়নশীলতার, এবং দুর্ব্বলতা সৌভাগ্য চিহ্নের নাম ধারণ করিল; এবং সংক্ষেপে আমি একজন দিব্যাঙ্গসুন্দর গন্ধর্ব্বপুরুষ হইয়া সকলের নয়নবিনোদনে প্রবৃত্ত হইলাম।

কথা আছে যে, বিবাহের ফুল না ফুটিলে এবং লক্ষ কথা পূর্ণ না হইলে, কখনও কাহারও বিবাহকার্য্য সিদ্ধ হয় না। গতিকে, কথোপকথনে এবং পাত্রীর অন্বেষণে দশ বার মাস ঐ রূপ দেখা দেখিতেই অতিবাহিত হইয়া গেলে, শেষে সত্য সত্যই এক দিন আমার বিবাহের ফুল ফুটিয়া উঠিল।

আমাদের বাসস্থান হইতে দিনেকের পথ দূরে এক-জন ধনাঢ্য বংশজ বসতি করিতেন। তাঁহার পাঁচ ছেলের পর সবে একটি মাত্র কন্যা। সুতরাং সে কন্যার অত্যধিক গৌরব ছিল। তিনিও সুপাত্রের অন্বেষণে দেশে দেশে লোক পাঠাইয়া ছিলেন। তাঁহার অনুচরেরা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া আমাকেই সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত সুপাত্র বলিয়া স্থির করিলেন, এবং আমার পিতা মহাশয়ও পাত্রীর উচ্ছলিত রূপ-লাবণ্য এবং অশেষ গুণপনা দর্শনে একবারে মোহিত হইলেন। উভয় পক্ষেই আগ্রহ জন্মিল; এবং ঐ আগ্রহ হেতু, ব্রাহ্মণের আদ্যশ্রাদ্ধের ন্যায়, অদূরদর্শী ও আমোদ-বিহ্বল যুবজনদিগের মিত্রতার ন্যায়, অথবা উৎকোচ-লুব্ধ কৃতসংকল্প বিচারকের বিচারকার্য্যের ন্যায়, মুখের কথা ফুটিতে না ফুটিতেই, আমার পিতা মাতার অত সাধের পুত্রবধূর সহিত শুভদিনে ও শুভক্ষণে আমার 'শুভ বিবাহ' সম্পন্ন হইয়া গেল। এ স্থলে কেবল এই মাত্র আপনাকে জানাইয়া রাখা আবশ্যক যে, এই 'শুভ বিবাহে' পিতা আমার সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। ধন-গর্ব্বিত সম্বন্ধ লোকের সহিত সমানে সমান চলিতে গিয়া, তাঁহার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই অল্প সময় মধ্যে ঋণের দায়ে ঠেকিয়া বিক্রয় করিলেন, এবং আমারও লেখা পড়া

ও বিদ্যাব্রহ্মণ্য, বঙ্গদেশীয় অসংখ্য বালকের বিদ্যালাভের ন্যায়, পাকতঃ ঐ পর্য্যন্তই একপ্রকার পরিসমাপ্ত হইল।

আপনি এইক্ষণ মনে করিতে পারেন যে, আমার পিতৃগৃহের প্রমোদনিবাসে তাদৃশ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল, ইহার উপর আবার সৌভাগ্য কি?—হউক মেন দারিদ্র্য দুঃখ, অমন রূপের ডালি যদি সতত সম্মুখে থাকে, তাহার উপর আবার শুভাদৃষ্ট কি? আপনি যদি সত্যই এই রূপ কিছু ভাবিয়া থাকেন, তবে আমার সৌভাগ্য ও শুভা-দৃষ্টের কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন।

বিবাহের সময়, আমার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর; আর আমার চিত্তহারিণী তখন একাদশীর চন্দ্রলেখা। রূপের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় নাই, অথচ তাঁহার রূপ তখনই যেন ঝলকে ঝলকে উছলিয়া পড়িতে চাহিতেছে। আমার পিতা পিতামহ প্রভৃতি সকলেই সুশিক্ষিত, সুপণ্ডিত এবং কার্য্যক্ষম লোক ছিলেন। কিন্তু, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই কোন দিন কবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। কারণ তাঁহাদিগের সময়ে "কবিওয়ালা" গায়কেরাই দেশের সমস্ত খোস কবিত্ব খাস দখল করিয়া বসিয়াছিল। বিষয়ী অথবা বিজ্ঞদিগের সহিত উহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু প্রেয়সীর সেই প্রণয়োৎফুল্ল পুষ্পিত সৌন্দর্য্যরাশি

আমাকে অচিরেই "কবিবর" করিয়া তুলিল। আমার মনে সংসারে বিরাগ জন্মিল; সকল প্রকার কার্য্যকর্ম্মেই অশ্রদ্ধা হইল, এবং আমার উৎসাহ, উদ্যম যাহা কিছু ছিল, সমস্তই ক্রমে ক্রমে ফুরাইতে লাগিল। আমি আমা ছাড়া হইয়া একবারে তদ্গত হইলাম, এবং নিষ্পন্দ সাধকের ন্যায় নয়নে নয়ন মিলাইয়া ঐ মুখ খানি নিরখিয়াই পড়িয়া রহিলাম।

যাহারা মানবজীবন লাভ করিয়া জীবনে কখনও রূপের উপাসনা করে নাই, তাহারা আমার সে সময়ের অবস্থা অনুভব করিতে পাইবে কি? আকাশে চন্দ্র উঠিত। চন্দ্র কোন্ দেশে কোন্ কালে না উঠে? তবে, আমার চক্ষে চন্দ্রোদয় তখন এক অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য। আমি একবার সে চন্দ্রের দিকে চাহিতাম, আবার আমার চারুমুখীর মুখ-চন্দ্র খানি নিবিষ্টচিত্তে চাহিয়া দেখিতাম। মানুষের মুখচ্ছবি এমন মাধুর্য্যময় হইতে পারে, ইহা দণ্ডে দশ বার দেখিয়াও প্রত্যয় করিতে ইচ্ছা করিতাম না। আমাদিগের আঙ্গিনায় মাঝে মাঝেই খঞ্জন তাহার আহারের অন্বেষণে উপস্থিত হইত। খঞ্জন কোথায় না আইসে? তবে, আমার কাছে খঞ্জন তখন এক নূতন বস্তু। খঞ্জন মাটিতে চরিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, খুঁটিয়া

খাইতে ভাল বাসে। খঞ্জন প্রকৃতপ্রস্তাবে নাচে না, কিন্তু তাহার মৃদুল-দোলনের স্বাভাবিক মোহনভঙ্গিই মনুষ্যের চক্ষে মনোহর নৃত্য। খঞ্জন খুঁটিয়া খাইবার জন্য, স্বভাবের স্ফুরণে, ঐ রূপ নাচিত, এবং আমার চক্ষু তখন প্রিয়তমার চির-চঞ্চল স্নিগ্ধশ্যামল অচ্ছিন্ন-ভ্রূচাপ-বেষ্টিত টল টল চক্ষু দুটির অপরূপ শোভা চিন্তা করিয়া দৃষ্টিশূন্য হইত। আমার তখন মনে লইত যে, রূপ বুঝি ফুলের ন্যায় সুগন্ধি, নবনীতের ন্যায় সুকোমল এবং সুধা কিংবা মধুর ন্যায় সুস্বাদু। নহিলে, জীবের মন ও প্রাণ, রূপের মোহময় আকর্ষণে, এমন আকৃষ্ট হইবে কেন? ছাত্রেরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও গণিতাদি যে সকল বিষয় লইয়া বিদ্যালয়ে পরিশ্রম করে, তৎসমূহের প্রতি আমার হৃদয়ে তখন প্রকৃতই অতি প্রগাঢ় ঘৃণা জন্মিল, এবং রূপের কথা, রূপ-বর্ণনা ও রূপসীর রূপই আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়টাকে একবারে গ্রাস করিয়া বসিল।

জীবনের স্রোত চিরদিনই যদি এই ভাবে, এই রূপ তরল তরঙ্গে, বহিয়া যায়, তবে সে এক মন্দ কথা নহে। কিন্তু, তাহা হয় কৈ? স্রোতে জোয়ারও আছে, ভাঁটাও আছে। আমার সে সুখ-স্বপ্নময় আনন্দের স্রোতেও দেখিতে না দেখিতেই ভাঁটা লাগিল। স্রোতস্বিনীর সে

প্লাবনী পরিপূর্ণতা ক্ষুধাতুরা পিশাচীর পরিক্লিষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করিল। চারি দিকে আশা ও আকাঙ্ক্ষার কতকগুলি ছোট ছোট লতা, যেন আমারই সুখ-সমীরে দুলিয়া দুলিয়া, ফুলের হাসি হাসিতেছিল; সেগুলি একে একে ঢলিয়া পড়িল। আমি অচিরেই ভাঁটার সে প্রবল টানে পড়িয়া বড় বেশী ফাঁপর হইলাম।

সুখ কাহাকে বলে, তাহা যদিও জানিতে পাই নাই, তথাপি বলিতে পারি যে, আমি পরিণয়ের পর কএক বৎসর কাল বিশেষ কোন দুঃখে দগ্ধ হই নাই। পিতা, তাঁহার তদানীন্তন নিঃস্ব অবস্থায়,—শুধু আত্মনির্ভরেরই অতুল গৌরবে,—সূর্য্যের উদয় হইতে সূর্য্যের অস্তগমন পর্য্যন্ত, প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া, আমাদের অন্ন বস্ত্র আহরণ করিতেন; আমি ঘরে বসিয়া, মৃদু-মারুত-সঞ্চালিত মৃণালবদ্ধ কমলের ন্যায়, আমার সৌভাগ্যের সরোবরে একবার ঈষৎ ডুবিয়া, একবার ঈষৎ ভাসিয়া,—কখনও সুখের কান্না কাঁদিয়া, কখনও দুঃখের গীত গাইয়া, সেই এক ভাবে দিন যামিনী যাপন করিতাম। আমি এ সময়ে আমার পিতৃদেবের একটু বিরাগভাজন হইয়াছিলাম বটে। কিন্তু, তাহা বুঝিয়াও বুঝিলাম না, অথবা বুঝিবার অবকাশ পাইলাম না। তিনি আমার জন্য অহোরাত্র

দুঃখকষ্ট ভোগ করেন, অথচ আমি তাঁহার দুঃখ ও শ্রমের ভার কমাইবার জন্য মুহূর্ত্তের তরেও কোন কাজ করি না, কিংবা মুখ তুলিয়াও একবার তাঁহার দিকে চাহি না, বোধ হয় এ কথাটা বৃদ্ধের হৃদয়ে মর্ম্মশল্য অথবা মর্ম্ম-দাহি গরলখণ্ডের ন্যায় লাগিয়া রহিয়াছিল। কিন্তু, আমি তখন পৃথিবীতে, না পৃথিবীর ঊর্দ্ধতন কোন স্বপ্নময় ধামে,—আমি তখন স্ববশ, না বিবশ, তাহা আমার বিষয়-বিঘ্ন-মগ্ন বৃদ্ধ পিতা বুঝিতে পাইলেন না। অবশেষে পিতা লোক-লীলা সংবরণ করিলেন; মাতা সংসারের ক্লেশ আর সহিতে না পারিয়া কাশীবাসিনী হইলেন;— একটি দুঃখিনী বিধবা ভগিনী ছিল, সে তাহার "দীন হীন" দেবর-গৃহে চলিয়া গেল। আর আমি?—আমি রাশীকৃত জ্বালা যন্ত্রণা এবং আমার সেই রূপের ডালি লইয়া সেই শূন্যগৃহে পড়িয়া রহিলাম। সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সংসার, সহস্রজিহ্বা প্রসারণ করিয়া, আমার রক্ত মাংস ও অস্থি মজ্জা লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং স্বপ্নোত্থি-তের কাছে যেমন হইয়া থাকে, আমার কাছেও তখন সকলই আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল।

আগে ভাবিতাম কাব্যই প্রকৃত স্পর্শমণি। উহা অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য সকলই আনিয়া দেয় এবং সকল

অভাবই যথাসময়ে মোচন করে। এখন দেখিতে লাগিলাম যে, উহা এক কথার কথা, উন্মত্তের কল্পনা, অথবা আকাশের ফুল। উহার সহিত পৃথিবীর কোন দিক্ দিয়াই কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই, এবং কোন অভীষ্টই উহার সাধনায় সিদ্ধ হয় না।

আগে জানিতাম, যে প্রেমিক সেই পূজ্য;—সেই দেবতা, সেই মানবজাতির মাথার মুকুট। মনুষ্যমাত্রেরই উচিত যে, প্রতিদিন ভক্তির সহিত তাহার পদ-ধূলি লয় এবং তাহাকে আলস্যের সুখ-শয্যায় শয়ান রাখিয়া তাহার সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দেয়। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা আর এক বিষম ভ্রম। মনুষ্যের এ আশা, মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায়,—মনোহারিণী অথচ চিরবঞ্চনাকারিণী। পৃথিবীর লোকেরা সকলেই কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ, সকলেই কর্ম্মজগতের অনুল্লঙ্ঘনীয় শাসনে সতত ব্যস্ত। কোন্ প্রেমিক কোথায় বসিয়া পূর্ব্বরাগ, প্রণয়, পরিণয়, মান ও বিরহ প্রভৃতি কোন্ পালার কি গীত কোন্ রাগিণীতে গাইতেছেন, কেহই তাহার সংবাদ লয় না।

আগে জানিতাম, মনুষ্যের প্রীতি আর প্রয়োজন, আলোক ও অন্ধকার অথবা উত্তাপ ও শৈত্যের ন্যায়, পরস্পর বিরুদ্ধ। এখন ইহা চক্ষে দেখিয়া এবং প্রাণে

প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া ভালরূপে বুঝিলাম যে, প্রীতি আর প্রয়োজন কোন কোন অংশে অভিন্ন বস্তু। কেন না, যেখানে যার যত বেশী প্রীতি, সেখানেই তার তত বেশী প্রয়োজন, এবং যেখানে অত্যধিক প্রয়োজন, সেখানেই মনুষ্যের অক্ষয় প্রীতির অচল আসন। পৌষ মাঘের নিদারুণ শীতের সময়ে, প্রেমময়ীর মৃণাল-কর-দোলিত বীজনও বিষের মত লাগে। কেন না, তখন উহাতে প্রয়োজন নাই। তখন অগ্নির একটু উত্তাপ পাইলেই প্রাণটা প্রফুল্ল হয়। আর নিদাঘের নৈশ জ্বালায় সেই অগ্নিই আবার বিষ, এবং সেই সমীর-স্পর্শই অমৃত। কেন না, অগ্নিতে তখন আর প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন তখন সমীর-তরঙ্গে। পিপাসায় যার প্রাণ যাইতেছে, নয়না-নন্দ কহিনুর দেখিলে কি তাহার নয়ন জুড়াইবে? আর, যে ব্যক্তি জলে ডুবিয়া প্রাণে মরিতেছে, তাহার কাছে এক পিয়ালা তুষার-শীতল স্বচ্ছ বারি উপহারস্বরূপ উপস্থিত করিলে, সে কি তখন প্রীতিতে হাত বাড়াইবে? সুতরাং, এ কথার আর অণুমাত্রও সংশয় নাই যে, প্রীতি আর প্রয়োজন প্রাণে প্রাণে গাঁথা। কালিদাসের একটি কবিতা বহুকাল হইতে আমার প্রাণপ্রিয়। কবিতাটি এই,——

কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে
ধৃতং তয়া বার্দ্ধকশোভিবল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা
বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে।

অর্থাৎ,—গিরিরাজকুমারী গৌরী জগদ্গুরু মহাদেবকে পতি লাভ করিবার জন্য যৌবনে যোগিনী সাজিয়াছেন, এবং নবযৌবনের উপযোগী আভরণনিচয় পরিত্যাগ করিয়া, বাকল পরিয়াছেন। মহাদেব, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে, গৌরীশিখর নামক বিজন পর্ব্বত-প্রদেশে, তাঁহাকে ঐ অবস্থায় প্রগাঢ় তপস্যায় নিমগ্ন দেখিয়া, সস্নেহ পরিহাস-চ্ছলে বলিতেছেন,——

এ কি ! কেন আভরণ ত্যজিয়া যৌবনে,
পরিয়াছ বার্দ্ধক্যের ভূষণ বাকল ?
উষার কুয়াসা কেন সন্ধ্যার গগনে !
কোথা সে চাঁদের টিপ, তারার কুন্তল ?

আমি সন্ধ্যার শোভা দেখিতে চিরদিনই বড় উৎসুক রহিতাম, এবং সন্ধ্যাকালে আকাশের পানে চাহিলেই আপনা আপনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করিতাম। কিন্তু একবার আমাদিগের দেশে বড় ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি

হইয়াছিল। ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ চলিয়া গেল, তথাপি বৃষ্টি হইল না। দেশে হাহাকার উঠিল। তরু লতা শুকাইয়া মরিতে লাগিল। মাটীর দূর্ব্বাও দগ্ধ হইয়া গেল। সন্ধ্যার স্বাভাবিক শোভা কবিকল্পনার দর্পণে তখন শতগুণ বাড়িল বটে। কিন্তু আমি তখন সন্ধ্যা-কালে আকাশের সে মনঃকল্পিত শোভার দিকে ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইতাম না। আকাশের সেই নিরভ্র নির্ম্মল মূর্ত্তি, সেই স্ফুট-চন্দ্র-তারক বিচিত্র দৃশ্য, আমার কাছে তখন, তৃষাতুরের নিকট মরুভূমির মত, অতি বিদ্বিষ্ট জ্ঞান হইত; এবং সঙ্গে সঙ্গে কালি-দাসের ঐ চির-পরিচিত ও চির-প্রীতিকর কবিতাটিও সে কালে যার পর নাই তিক্ত লাগিত। তখন সত্য সত্যই এ কথাটা আমার হৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত হইল যে, যেখানে যার হৃদয় মন অথবা জীবনের প্রয়োজন নাই, সেখানে কখনও তাহার প্রীতি থাকিতে পারে না। প্রয়োজন বলিলেই যে নিতান্ত নিন্দিত প্রয়োজন বুঝা-ইবে, এমন কথা কে বলিয়াছে?

আগে ইহাও মনে করিতাম যে, পৃথিবীর সার প্রাণি-বর্গ; প্রাণিজগতের সার মনুষ্যজাতি; মনুষ্যের সার রমণী; রমণীর সার রূপ। রূপই স্বর্গ, রূপই সম্পদ, রূপই

সকল সুখের প্রস্রবণ। যেমন যেখানে চন্দ্র, সেইখানেই জ্যোৎস্না এবং সেইখানেই অমৃত; তেমন যেখানে রূপের হিল্লোল, সেইখানেই গুণের গরিমা, সেখানেই হৃদয়ের বিলাস-লীলা এবং সেখানেই প্রীতি ও প্রফুল্লতার নিত্য আনন্দ। আমার এই বিশ্বাসও, এক দিনে দুদিনে, একটু একটু করিয়া টুটিতে লাগিল। কেন টুটিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি ?

আমার কুসুমে এত দিনের পর কীট পশিল। আমারও চক্ষু ফুটিল, এবং প্রেয়সীর কুসুম-কোমল মোহন অধরেও এত দিনে ক্রমে ক্রমে কঙ্করের ন্যায় কঠোর কথা সকল ফুটিতে লাগিল। ধন্য মনুষ্যের প্রকৃতি! ধন্য অবলার প্রেম! যিনি রঙ্গভূমিতে, একবার শকুন্তলার সাজ সাজিয়া, সুধামাখা কথা কহিয়া সকলকে মোহিত করিয়া যান, তিনিই যদি আবার দুরক্ষরভাষিণী কৈকেয়ী কিংবা দুর্দ্ধর্ষদর্শনা শূর্পণখার সাজে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে ভয়ে শশব্যস্ত করিয়া তুলেন, তাহা কেমন দেখায়? আমার অবস্থাপরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে, হৃদয়বল্লভার এই আকস্মিক বেশপরিবর্ত্তও আমার নিকট ঠিক তেমনই বোধ হইল। যিনি পূর্ব্বে ফুলটি, ফলটি, লতাটি, পাতাটি পাইয়াই আহ্লাদে ডগ মগ হইতেন, তিনি এইক্ষণ

রজত-কাঞ্চনাদি পাপবস্তুচয়ের জন্য প্রমত্ত হইলেন। যাঁহার হৃদয়রূপ পুণ্যতীর্থের পঞ্চক্রোশীর মধ্যেও, সুখের দিনে, লোভের কোন সম্পর্ক ছিল না, এইক্ষণ দুঃখের দিনে লোভই তাঁহার হৃদয়ের অধিপতি হইল। যাঁহার প্রাণের অনুরাগ শুধু গ্রন্থপত্রেই আবদ্ধ ছিল, তাঁহার প্রাণ এইক্ষণ বেশবিন্যাসের উপযোগি বস্ত্রাদির জন্য পাগল হইল। যাঁহার অভিমানের ক্রোধ, অতিমাত্রায় উপচিত হইলেও, পূর্ব্বে ত্রিতন্ত্রীর ঝঙ্কারের ন্যায়, প্রাণ মন কাড়িয়া লইত, তাঁহার কণ্ঠরবে এইক্ষণ কাংস্য করতাল এবং ঢক্কারবও নীচে পড়িল। লজ্জা, সৈকতভূমিতে ভাঁটার জলের মত, দেখিতে দেখিতেই অপসারিত হইল; সম্ভ্রমের ভাব দূরে পলায়ন করিল;—এবং পৃথিবীর যত কিছু আপদ, সমস্ত আসিয়া, যেন মন্ত্রণা করিয়া, আমার সেই দীন-নিবাসে নিত্য নূতন যন্ত্রণার আকারে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

আমার আর এক দুর্ভোগ হইল প্রিয়তমার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অনন্তপ্রকারের রোগ। যিনি আমার সৌভাগ্যের সময়ে বসন্তের কোকিলা কিংবা বর্ষাকালের রাজহংসীর ন্যায় সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ ছিলেন, এইক্ষণ প্রায় সকল সময়েই তিনি রোগের শয্যায় ছিন্নমূল লতার ন্যায় জীর্ণ,

বিশীর্ণ ও হীনপ্রভ। পাড়ায় কাহারও বাড়িতে উৎসব হইতেছে, সেই উৎসবের আনন্দময় কোলাহলেও তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন। অথবা, ইদানীং পল্লীতে কাহারও গৃহে কোন রূপ উৎসব কিংবা উপদ্রবের সাড়া শব্দ নাই, তিনি চারিদিকের সেই নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যেও বায়ুর প্রকোপে অস্থির হইতেছেন। শীতে তাঁহার সে সুকোমল তনু শৈত্যক্লেশে অবশ হয়, গ্রীষ্মেও উহা অবসন্ন হইয়া পড়ে। সূর্য্যের প্রখর তাপ ত শরীরে সহিবারই নহে ; কিন্তু চন্দ্রের শীতল জ্যোৎস্নাও তাঁহার কাছে কখনও কখনও দগ্ধকঙ্করের ন্যায় অনুভূত হয়। তিনি যখন তাঁহার হৃদয়ের সেই একপ্রকার অভাবনীয় উচ্ছ্বাসে একটুকু বেশী কথা কহিতে ইচ্ছা করেন, সেই সময় ভিন্ন প্রায় সকল সময়েই তিনি এই রূপ রুগ্ন।

মনুষ্যের মনে কেন এই রূপ বিপর্য্যয় ঘটে, তাহার অনুসন্ধান করা আমার অভিপ্রেত নহে। আমি একে অপণ্ডিত, তাহাতে এইক্ষণ বিপাকে পড়িয়া অরসিক। ঐ সকল কথার তত্ত্ব নিরূপণের ভার আপনাদের মত লোকের উপর। আমি আমার বর্ত্তমান গার্হস্থ্য জীবনের সামান্য একখানি ছবি আঁকিয়া তুলিতে পারিলেই আপনাকে আপনি কৃতার্থ জ্ঞান করিব। আপনি কৌতু-

কের কথা চান, না করুণরসের কথা ভালবাসেন? আমার এই কাহিনীতে দুইই পাইবেন এবং তাহার উপর বীর-রসেরও ছিটাটা.ফোঁটাটা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

আমাদের গৃহে এইক্ষণ এক এক দিন এক এক নাটকের অভিনয় হয়; দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহারা বই আর কেহ দর্শক থাকে না। কোন দিন গৃহিণী পাঠশালার গুরুমহাশয়, আমি পলাতক ছাত্র। তাঁহার সে পাঠশালায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একবার ভয়ে দুই পদ অগ্রসর হইতেছি; আবার ভয়ে, যেন সে পুরাতন নবাবী কায়দায়, এক পদ পিছু যাইতেছি। কোন দিন তিনি অজ গজ গোছের একটি মফঃস্বলী হাকিম, আমি দস্তকের আসামী, অথবা ভীতি-বিহ্বল বিপন্ন আমলা। তখন কাহার সাধ্য, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিবে? কোন দিন আবার আমি অমাবস্যার শব-সাধনে উপরত সাধক, আর তিনি আলুলিতকেশা, বিকটবেশা আরক্তলোচনা উগ্রভৈরবী! আমার ইহাই বিশেষ পরিতাপ যে, এই রঙ্গলীলায় আমি এক দিনও বেশ বিনিময় করিতে অধিকার পাই না। কারণ, অপরাধের ভাগ সমস্তই আমার। আমি বামন হইয়া চাঁদে হাত দিয়াছি, চণ্ডাল হইয়া ব্রাহ্মণ স্পর্শ

করিয়াছি, কুক্কুর হইয়া যজ্ঞের ঘৃত খাইয়াছি ;—অথবা আমার মত দাঁড়কাকের ভাগ্যে তাদৃশ পাকা আম যুটিয়াছে, আমা হেন মর্কটের গলায় তাদৃশ মতির হার ঝুলিয়াছে,—আমার "অশুভ বিবাহে" বরাহের দন্তে বিমল গজমুক্তার বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে; অতএব কোন শাস্তিই আমার উচিত ও উপযুক্ত শাস্তি নহে।

প্রথম বয়সে আমার যে চরিত্র, প্রেয়সীর প্রেমাঞ্জনস্নিগ্ধ ছল ছল প্রফুল্ল চক্ষে, চাতক, চকোর ও চক্রবাকের মনোহর প্রকৃতি হইতেও অধিকতর মুগ্ধ প্রতীয়মান হইত, আমার সেই চরিত্রের আদি অন্ত, সমস্তই এইক্ষণ নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্ট গৃধ্রশকুনির চরিত্রের ন্যায় নিন্দনীয়। আমি সভায় গিয়া ভেকরাগিণীতে বক্তৃতা করিতে পারি না; অতএব আমি অশিক্ষিত ও অধার্ম্মিক। আমি নট-কবিদিগের নাচনিচ্ছন্দে গীতি-কবিতা লিখিয়া পাঁচ জনকে প্রমোদিত করিতে পারি না; অতএব আমি অপ্রেমিক। আমি নিরীহ প্রতিবেশিদিগের সহিত নিরর্থক গলা বাজাইয়া কোন্দল করিতে পারি না, অথবা কাহারও উৎপীড়নে যাই না; অতএব আমি অকর্ম্মণ্য কাপুরুষ। আর, আমি তাঁহাকে বিরহিণীর দশ দশা পরীক্ষা করিয়া বুঝিবার জন্য, বাড়িতে একা রাখিয়া, অর্থোপার্জ্জনের

অভিলাষে, ব্রহ্মদেশে কিংবা দূরতর বিদেশে, চলিয়া যাইতে সাহস পাই না; অতএব আমি অন্তঃসারশূন্য ভেতো বাঙ্গালি।

আজ আকাশে মেঘ নাই, সে আমার দোষ। আজ বৃষ্টির জন্য ঘরের বাহিরে যাওয়া যায় না, সেও আমার দোষ। আমি মধ্যাহ্ন-রৌদ্র-তপ্ত এক জন অভুক্ত দরিদ্রকে এক মুষ্টি তণ্ডুল তুলিয়া দিলে, তাহা অপরিণামদর্শিতা অথবা অপব্যয়। আর, আজ ঘরে খাবার নাই ইহা জানিয়াও যদি তিনি, পায়ে আলতা অথবা গায়ে একখানি আভরণ পরিবার উদ্দেশ্যে, আমার পিতার সময়ের নিতান্ত মূল্যবান্ একটি বস্তু অতি অল্পমূল্যে বিক্রয়ের জন্য উদ্যোগ করেন, তাহার নাম উদারতা অথবা উচ্চবংশের অপরিহার্য্য উচ্চনীতি। যদি আমার আহ্বানে ঘরে অতি অল্প বয়স্ক একটি শিশুও আসিয়া দুদণ্ড উপবিষ্ট রহে, তবে লোকের জ্বালায় সেখানে টেঁকা যায় না; এবং যদি তাঁহার অনুরোধে নবীনা ও প্রবীণা প্রভৃতি পাড়ার সর্ব্বপ্রকার জ্বালাতনকারিণীরাই ঐ সংকীর্ণ স্থানে আসিয়া জড় হন, তথাপি পোড়া ঘরে আগুন দিয়া লোকের সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিবার সাধ পরিপূর্ণ হয় না।

মহাশয়! আর বলিব কি? প্রভাত-সূর্য্য, সান্ধ্যসমীর এবং নৈশ-গগন সকলেই আমার যন্ত্রণার সাক্ষী। ভব-যন্ত্রণা কাহাকে বলে, তাহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতাম না, এইক্ষণ অক্ষরে অক্ষরে বুঝিতে পাইতেছি। রেলের গাড়ী যেমন ঘড় ঘড় নাদে অবিরামগতি চলিয়া যায়, আমার সকল উদ্বেগের আকররূপিণী প্রিয়তমার ঐ মধুমাখা জিহ্বাখানিও ঘটিকায় ঘটিকায়, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, ঐ রূপ অবিরাম চলিতে থাকে। দিনে, নিশীথে, কখনও এই অশ্রান্তগতির বিশ্রাম নাই। কিবা তাঁহার তথাবিধ রোগে, কিবা তাঁহার নিত্য নূতন দুর্ভোগে, কোন অবস্থাতেই উহার নিবৃত্তি নাই।

বর্ষাবিপ্লুত নভোমণ্ডলে, ঘনঘটা কখনও থাকে, কখনও থাকে না। আমার রূপাভিমানিনীর মুখমণ্ডল এই-ক্ষণ সকল সময়েই নিবিড় মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন থাকে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসে কিংবা অঞ্চল-তাড়নে ঝড় বহিতেছে; এই অশ্রুধারায় বৃষ্টি হইতেছে। এই নয়নপ্রান্তে ক্ষণপ্রভা ক্ষণিক খেলা দেখাইয়া লুক্কায়িত হইতেছে, এই আবার রসনারূপ অমোঘ অশনির ভয়ঙ্কর নির্ঘোষ আমার হৃদ-য়কে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপাইয়া তুলিতেছে।

আমার অনুপ্রাসচ্ছটা দেখিয়া আপনি বিরক্ত হই-

বেন না। ইহা ইচ্ছাকৃত নহে। কবিতার নাম সহানুভূতি। সুখ ও দুঃখ, দুইয়ের সহিতই উহার সমান সম্বন্ধ। মানুষ যখন কাঁদিতে চায়, পর-দুঃখ-কাতরা কবিতা তখনও প্রিয়সখীর ন্যায় কাছে বসিয়া তাহাকে বাছিয়া বাছিয়া শব্দ যোগায়। নহিলে, আকুল-হৃদয় অজ এবং আলুলিতকুন্তলা রতির বিলাপে অনুপ্রাসের অমন অপূর্ব্ব বিলাস পরিলক্ষিত হইত না। অতএব পরিহাস-রসিকতা পরিত্যাগ করিয়া, আমায় এখন উপদেশ দিবেন; আমি কি উপায় অবলম্বন করিলে, এই জঞ্জাল এবং এই হাতে পায় বাঁধা বিপজ্জাল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, আমায় সেই পথ প্রদর্শন করিবেন।

আমার বুদ্ধিসাধ্যে যাহা কিছু যুটিয়াছিল, সমস্তই করিয়া দেখিয়াছি; তাহাতে কোন অংশেও কোন ফল ফলে নাই। এক জনে বলিয়াছিলেন, বসন্তপঞ্চমীতে বীণা ও বেণুর পূজা না করিয়া, নাদ-বিদ্যা-রূপিণী ঢক্কাদেবীর পূজা করিলে, গৃহিণীর ঢক্কানুকারিণী মুখরতা নিবৃত্ত হয়। আমি তাহা করিয়া আরও বিপন্ন হইয়াছি। আগে শুধু মূর্খ ছিলাম, এইক্ষণ মূর্খের উপর আবার ডাকিনীমন্ত্রের উপাসক বলিয়া অবিরত ধিক্কৃত হইতেছি। আর এক জন কুচক্রী আমায় বোকা পাইয়া বুঝাইয়াছিলেন যে,

যেমন দ্বিদল-দ্রব অন্তর্দ্দাহে উথলিয়া উঠিলে একটুকু স্নিগ্ধ বস্তুর প্রক্ষেপেই তৎক্ষণাৎ আবার প্রশমিত হয়; তদ্রূপ মুখরা ভার্য্যার উদ্বেল ক্রোধাবেগও পতির নয়ন-জল-প্রক্ষেপরূপ কোন না কোন শীতল প্রক্রিয়ায় তন্মুহূর্ত্তেই শান্তি লাভ করে। আমি কর্ম্মদোষে, এক দিন এই কুপরামর্শে কর্ণপাত করিয়া, এইক্ষণ অশেষ বিড়ম্বনা ভুগিতেছি, এবং অহোরাত্র সেই কুসুম-কোমল অথচ কঙ্কর-কঠোর জিহ্বার জ্বালায় পুড়িয়া পুড়িয়া মরিতেছি। আমার পরিত্রাণের জন্য কোন পন্থাই কি আর নাই?

সম্পাদকের কথা।

আমরা এ পত্রখানি পড়িয়া দুঃখে বিগলিত হই নাই। কারণ, রূপ-রঙ্গিণী কুল-রমণী যদি রূপের চটক বাড়াইবার জন্য, নয়নে কাজল পরিতে যাইয়া, মুখে নখের আঁচড় লাগাইয়া, শেষে বিরলে বসিয়া বিলাপ করে, সে বিলাপে লোকের দুঃখ হয় না; বরং হাসি পায়। রমণীরঞ্জন কুল-পাবন যুবাও যদি প্রেমের পরীক্ষারূপ নাটকশিক্ষার বিকৃত অভিলাষে, অথবা নবোঢ়া পুর-কামিনী লইয়া নিত্য নূতন নাটকের পট সাজাইবার উদ্দেশ্যে, পারিবারিক জীবনের চিরপরীক্ষিত অবলম্বস্বরূপ ভক্তির ভিত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, শেষে ফাঁপরে

পড়ে, কিংবা বিলাস-লীলার কুসুম তুলিতে যাইয়া, শেষে কাঁটার আঁচড়ে ছট্‌ফট্ করিতে রহে, লোকের তাহাতে খুব বেশী দুঃখবোধ হওয়া স্বাভাবিক নহে। অপিচ, লেখক স্বগৃহচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, না পরের ঘরে উঁকি মারিয়া একটু আধটু যাহা দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাই কল্পনার তুলিতে নানা রঙে রঞ্জিত করিয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, সে বিষয়েও আমাদিগের সংশয় আছে। আমরা তথাপি, তাঁহার এই অতিচিত্রিত বর্ণনাই স্বীকার করিয়া লইয়া, প্রতীকারের পথ দেখাইতে যত্নবান্ হইব।

বর্ণিত অবস্থা, আমাদিগের বিবেচনায়, গার্হস্থ্য-জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা নহে। ইহার নাম গৃহিণী-রোগ, এবং গৃহলক্ষ্মীর অপ্রাকৃত মুখরতাই ইহার প্রধান উপসর্গ। আমরা যে অপ্রাকৃত শব্দটি ব্যবহার করিলাম, তাহার বিশিষ্ট হেতু আছে। মুখ থাকিলেই মুখরতা জন্মে; সুতরাং আমরা সর্ব্বপ্রকার মুখরতাকেই দোষ বলিতে পারি না। কিন্তু মুখরতা যখন প্রকৃতির সীমা লঙ্ঘন করে, তখন তাহাকে দোষ বলি, এবং সেই দোষ গাঢ়তর হইলে রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। মানিনী মুখরা; সে বসন্ত-বিলাসিনী কোকিলা কিংবা এস্রারের মত।

প্রণয়বিহ্বলা বর-বর্ণিনীও কখনও কখনও মুখরা; সে কল-কল-বাহিনী স্রোতস্বিনীর মত। কিন্তু কোন কোন চারুমুখীর মুখরতা যথার্থই চড়কা কিংবা ভাঙা ঢাকের বিকট শব্দের ন্যায়, এবং উহা এক ভয়ানক রোগ। ঐ রূপ রুগ্ন স্ত্রীলোকের স্বামীকে পণ্ডিতেরা বিলাতে কুক্কুটীক্ষুণ্ণ এবং এ দেশে গৃহিণীগ্রস্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

এই রোগের * প্রকৃত নিদান নিরূপিত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু ইহার লক্ষণাদি সহজবোধ্য। ইহার প্রথম সঞ্চার সময়ে চক্ষু শিশির-সিক্ত প্রভাতপদ্মের ন্যায় একটুকু আর্দ্র অথচ ঈষৎ লোহিত বর্ণ হয়, ভ্রূযুগ অল্প অল্প আকুঞ্চিত হইয়া আইসে, নাসা স্ফীত হইতে থাকে, এবং অধর ও ওষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অঙ্গ কেমন এক তাড়িত-তরঙ্গের আকস্মিক স্ফুরণে কাঁপিতে রহে। রোগ দীর্ঘস্থায়ী হইলে অবস্থা আরও একটুকু আশঙ্কাজনক হয়, এবং অপস্মারের সহিত তখন ইহার

---

* Havelock Ellis নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত তদীয় "Man and Woman: A Study of Human Secondary Sexual Characters" নামক পুস্তকে Neurasthenia রোগের যে সকল বিচিত্র লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় প্রমোদ-লহরীর গৃহিণীরোগ নিতান্তই কল্পনার কথা নহে।

অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না, তখন চক্ষু শুধু আরক্ত না রহিয়া চক্রের মত আবর্ত্তিত হয়, হস্ত পদ ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, মুখ ফেনিল হইয়া উঠে, অঙ্গযষ্টি খানি এলাইয়া পড়ে, এবং রোগী ভাবাবিষ্ট ব্যক্তির মত অনর্গল প্রলাপ বলে।

যাহা হউক এ ব্যাধি অচিকিৎসনীয় নহে। হোমিও-প্যাথিসম্মত "সদৃশ চিকিৎসা" অবলম্বন করিলে, চিকিৎস-কের বুদ্ধি বলে, কোন কোন স্থলে ঝটিতি রোগের প্রশ-মন হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে প্রায়শঃই আহার নিদ্রায় অরুচি জন্মে, এবং রোগী অনেক স্থলে অনাহার ও অনিদ্রার ক্লেশে, বাতাহত লতার ন্যায়, ঢুলিয়া পড়ে। এ প্রণালীর প্রতিবিধানে রোগও একবারে নির্ম্মূল হয় কি না, সন্দেহ। ইহা এক আশ্চর্য্য কথা যে, পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিগের দুইটি প্রধান লোক এই সদৃশ-পদ্ধতির পক্ষ-পাতী। শেক্ষপীরকৃত কর্কশার বশীকরণ নামক নাটকা-কৃতি চিকিৎসাগ্রন্থ অনেকেই হয় ত পাঠ করিয়াছেন। উহাতে আগুনের উপর আগুন ঢালার মত চিকিৎসার যেরূপ অভিনব ব্যবস্থা আছে, আমাদিগের কালি-দাসও এ বিষয়ে ঠিক্ ঐ রূপই আর এক ব্যবস্থা, অল্পা-ক্ষরগ্রথিত সূত্রের ভাষায়, বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

যাঁহারা না জানেন, তাঁহারা তদীয় "বিষস্য বিষমৌষধম্" এই চিকিৎসাসূত্রের টীকা ও টীপ্পনী পাঠ করিবেন ; এবং ইচ্ছা হইলে, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়, কুত্রচিৎ কখনও, বিশেষ সাবধানতার সহিত ও মৃদুভাবে, উহা প্রয়োগ করিয়া দেখিবেন।

এলোপ্যাথির "বিরুদ্ধচিকিৎসা," বহুকাল-কলনীয় ও চিকিৎসকের পক্ষে বহুক্লেশকর হইলেও, রোগীর অধিক মনঃপ্রিয় এবং বোধ হয় রোগের নির্ম্মূলতাসাধনেও অধিকতর অনুকূল। সক্রেতিশের গৃহিণী এই রোগে অভিভূত ছিলেন, এবং ফরাশি রুশোর শেষবয়সের প্রেয়সীও অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহার অকথ্য যন্ত্রণা অনুভব করেন। শুনিয়াছি, তাঁহারা উভয়েই এই প্রণালীর চিকিৎসায় রোগমুক্ত হন। কিন্তু বিরুদ্ধচিকিৎসা, অর্থাৎ উত্তাপে শৈত্য এবং উগ্রতার সম্মুখে শম-দম-নম ভাব, অবলম্বন করা, যে সে ব্যক্তির কর্ম্ম নহে। ইহার অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহা সকলে বুঝিতে পায় না। চিকিৎসকের একটুকু যোগ-বিদ্যা, একটুকু দর্শন ও বিজ্ঞান জানা চাই, এবং মৈস্মর তত্ত্ব প্রভৃতি অপ্রচলিত তন্ত্রাদিতেও ভালরূপ দীক্ষিত হওয়া চাই। তাহা হইলেই সিদ্ধি, নচেৎ ঔষধ-প্রয়োগের পদে পদেই বিষম বিপদ।

পত্রলেখক স্বভাবতঃই যেরূপ মৃদুল-মতি, মধুরভাষী এবং স্বাদগ্রাহী, যদি তিনি সেইরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন ও লোক-প্রকৃতিজ্ঞ হন, তবে তাঁহার পক্ষে উপরোক্ত দুই প্রণালীর মধ্যে শেষোক্ত প্রণালীই আমাদিগের বিবেচনায় অধিকতর প্রশস্ত। তাঁহার উদ্বেল দ্বিদল-দ্রব এবং নয়ন-জল-নিক্ষেপই এ কথার প্রমাণ। কিন্তু, উপযুক্ত সময়ে নয়নের এক ফোঁটা জলে যে উপকারের আশা করা যাইতে পারে, অনুপযুক্ত সময়ে এক কলসীতেও তাহা হইয়া উঠে না। তাঁহার গৃহিণী আবার যখন হুঙ্কার-ঝঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠেন, কিংবা ফণিনীর মত মাথা ফুলাইয়া, নয়ন বাঁকাইয়া দুলিতে আরম্ভ করেন, তখন সিদ্ধমন্ত্র সাপুড়িয়াদিগের ন্যায়, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, এবং স্বকীয় হস্তদ্বয়ের সম্পৃক্ত-বন্ধনে সুন্দর একটি আবাহনী মুদ্রা অথবা মুদ্রাবদ্ধ অঞ্জলি রচনা করিয়া, তার-স্বরে তদীয় স্তুতিবন্দনায় রত হওয়াই তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। যদি তিনি বুকে এত টুকু সাহসও বান্ধিতে না পারেন, তাহা হইলে নিহিলোপ্যাথি অর্থাৎ নীরব-কবির নিশ্চিন্ত-নিস্পন্দ সুগভীর নিদ্রালুতাই তাঁহার শেষ পথ। তার পর—ফলাফল—অদৃষ্ট।

বিবাহ কত প্রকার।

আকাশে কত তারা, মানুষ তাহা গণিয়া দেখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু, পৃথিবীতে কত প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে, অথবা বিবাহপ্রথা দেশ কাল ও পাত্রভেদে কত প্রকারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, মানুষ তাহা গণিয়া নিরূপণ, কিংবা নিঃশেষ, করিতে পারে নাই।

ভারতীয় আর্য্যসমাজের পুরাতন ব্যবস্থাগুরু বিখ্যাত-নামা মনুর মতে বিবাহ আট প্রকার। যথা,—

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচাষ্টমোধমঃ।

অর্থাৎ,—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং সকলের অধম পৈশাচ এই আট প্রকারে বিবাহ হয়।

সুশিক্ষিত ও সুশীল ব্যক্তিকে বররূপে আহ্বান করিয়া, বাড়িতে আনিয়া, বর-কন্যা উভয়কেই বস্ত্রালঙ্কারের দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক কন্যাদানের নাম ব্রাহ্মবিবাহ। *

---

* আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

ভারতবর্ষীয় ভদ্রবিশিষ্টের ঘরে উল্লিখিতরূপ ব্রাহ্ম-বিবাহই বহুকাল হইতে বেশী প্রচলিত। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন আর্য্যেরা এখনকার মত অতিরিক্ত সভ্য না হইলেও, তাঁহারা বরে এক খুঁজিতেন বিদ্যাবত্তা, আর খুঁজিতেন সুশীলতা। সুশীলতা বলিলে অনেক কথাই তাহার মধ্যে আইসে। কেন না, ভক্তি প্রীতি, বিনয় মাধুর্য্য, মধুর-ভাষিতা ও উদারতা, এবং পর-সুখ-পরায়ণতা প্রভৃতি নানাবিধ উচ্চভাবই ঐ এক শীলতা অথবা সুশীলতা শব্দের অন্তর্গত।

বর যদি বিদ্বান্ এবং এত গুণের সম্পর্কহেতু সুশীল হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, সে পৃথিবীর হিসাবে দরিদ্র হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে দেবতা। প্রাচীনেরা, সম্ভবতঃ এই রূপ মনে করিয়াই, কার্য্য করিতেন এবং পরিজনদিগকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন যে, দেবতার নিকট কন্যাদান অপেক্ষা কন্যাসম্বন্ধে আর অধিকতর প্রার্থয়িতব্য কি হইতে পারে। কিন্তু, কালে সকল দেশেই রুচির পরিবর্ত্ত ঘটে। দেশীয়দিগের রুচির পরিবর্ত্তহেতু ইদানীং এ দেশে বরে ঐ তুইটি গুণের অর্থাৎ বিদ্যা ও সুশীলতার আর তেমন আদর নাই; এখন আদর ও অনুরাগ বরের বহিরাবরণে ও ধনে।

অপিচ, বিদ্যার পরীক্ষারূপ বিপত্তিটা বরকে ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে কন্যার দিকেই বেশী গড়াইতেছে, এবং ছেলেটি যেমন তেমন হউক, মেয়েটি লেখা পড়ায় সুনিপুণা কি না, এই একটা কথা, দেশের অধিকাংশ স্থলেই, সর্ব্বদা শুনা যাইতেছে। বরের হস্তাক্ষর চিংড়ি মাছের ঠ্যাঙের মত কদর্য্য এবং ঘৃণার্হ হইলেও তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু মেয়ের হস্তাক্ষর যদি মুক্তামালার ন্যায় মনোহর না হয়, সে বড় দূষ্য কথা। বর যদি স্বকীয় মাতৃভাষায়, শুদ্ধ ও সুন্দর শব্দযোগে, সামান্য একখানি পত্র লিখিতেও অসমর্থ হয়, তাহাতে লজ্জার কোন কথা নাই। সে যদি 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এ নামটি উচ্চারণ করিতে না পারিয়া, তৎপরিবর্ত্তে "শ্রীমতী বৃন্দাদূতীর গীত" বলিয়া বসে, এবং আপনার অপ্রতিম মূর্খতায় আপনিই সকলের আগে খিল খিল করিয়া হাসে, তাহাতে কেহই লজ্জা অনুভব করিবে না। সে যে তাহার বাপকে ফাদার ও শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনদিগকে ষাঁড় বলিয়া সম্ভাষণ করিতে শিখিয়াছে, এবং মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কাছে বসিয়াও, জল না চাহিয়া, ওয়াটার বলিয়া হাঁকিতে পারিতেছে, এই পাশ করা বিদ্যাই তাহার জন্য প্রচুর। কিন্তু, মেয়েটি যদি দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী" অথবা একখানি

"বঙ্গবাসী" হাতে লইয়া তৈয়েরী তোতার মত "ত্বরিত-গতি" পড়িয়া যাইতে না পারে, তাহা হইলে বর-পক্ষী-য়েরা সকলেই, ক্রোধে ও নৈরাশ্যে, হতবুদ্ধির মত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া থাকিবে।

তার পর, বরের শীলতা । দেশের অভিনব আচারে এবং বিদেশীয় সভ্যতার অভব্য অত্যাচারে ক্রমে এই রূপ ঘটিয়া উঠিতেছে যে, বর যতই নির্লজ্জ, নিঃসঙ্কোচ, এবং উদ্ধত ও অহম্মুখ বলিয়া পরিচয় পাইবে, যদি তাহার গায়ে ইট শুরকি চূণের অথবা অন্য কোন প্রকার বিষয় সম্পদের কিঞ্চিন্মাত্রও গন্ধ থাকে, তাহা হইলেই সে বরের হিসাবে তত বেশী বরণীয় হইবে। এই রূপ বরে কন্যাদানই এই-ক্ষণ শাস্ত্রসম্মত ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

দৈব-বিবাহ এখন এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে। পুরাতন কালে ঋষিরা যখন জ্যোতিষ্টমাদি যজ্ঞের অনু-ষ্ঠান করিতেন, তখন তাঁহারা কখনও কখনও যজ্ঞারম্ভ-কালে, সেই যজ্ঞের কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিতকে সালঙ্কৃত কন্যা দান করিয়া কৃতদার বানাইয়া লইতেন। ঐ প্রকার দান-সম্পাদ্য বিবাহের নাম দৈব-বিবাহ।

* যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্মকুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥

কিন্তু, এক্ষণ সে যজ্ঞও নাই, যজ্ঞের পুরোহিতও নাই। সুতরাং এখন আর এ দেশে দৈব-বিবাহের সম্ভাবনা কোথায়? যদি দৈব-দোষে, দায়ে ঠেকিয়া, কাহারও না কাহারও জাতিমানের জীবন্ত বোঝা অথবা কুলের "গোজা" গছিয়া লওয়াকেও দৈব-বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত না হয়, তবে সে এক পৃথক্ কথা। কেন না, তাদৃশ "দৈব" অথবা দুর্দ্দৈব বিবাহ এখনও দেশের অনেক স্থলেই অনেক সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

দৈবের পর আর্ষ। আর্ষ বিবাহও এক্ষণ অপ্রচলিত। একটি গাভী এবং একটা বৃষ এই দুইয়ে হয় এক গো-মিথুন। পূর্ব্বে কোন কোন গৃহধর্ম্মপরায়ণ ঋষি, অথবা জনপদবাসী গৃহস্থ, বরের নিকট হইতে এক কিংবা দুই গো-মিথুনমাত্র গ্রহণ করিয়া, যথাবিধানে কন্যাদান করিতেন। উল্লিখিতরূপ দানসিদ্ধ বিবাহের নাম আর্ষ-বিবাহ।* গরীব দুঃখী গৃহস্থদিগের মধ্যে এখনও অনেকে কন্যার বিনিময়ে গো-মিথুন গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু শুধু ঐ রূপ গো-মিথুন গ্রহণদ্বারাই বিবাহটা আর্ষ হইয়া পড়ে কি না, পাঠক তাহা বিচার করিবেন।

---

* একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥

প্রাজাপত্য বিবাহটা প্রকৃতপ্রস্তাবে কি পদার্থ, তাহা আমার বুদ্ধিস্থ হইতেছে না। "তোমরা দুইয়ে, মিলিয়া মিশিয়া, গার্হস্থ্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর," বর ও কন্যাকে এই কথা কহিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক কন্যাদানের নাম প্রাজাপত্য বিবাহ। * এইক্ষণ প্রথম জিজ্ঞাস্য এই, এ কথা কহিতেছেন কে? কন্যার পিতা কিংবা মাতা, অথবা জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি কোন ঘনিষ্ঠ অভিভাবকই বর ও কন্যাকে সাধারণতঃ এই রূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্ম ও দৈব প্রভৃতি দান-সম্পাদ্য বিবাহমাত্রেই ত প্রকারতঃ এই রূপ উপদেশের প্রথা আছে। এমন স্থলে প্রাজাপত্য বিবাহে আবার এই অতিরিক্ত উপদেশের বিশেষ ব্যবস্থায় কি বিশেষ ফল সিদ্ধ হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

আসুর বিবাহের সমস্তই সোজা কথা, এবং আজিকার এই অসুর-স্বভাব ভারতে অসংখ্য লোকই উহার মর্ম্মার্থটা ভালরূপ বুঝিয়া লইয়াছেন। কন্যার পিতা অর্থগৃধ্নু। তিনি কিছু চাহিতেছেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে, তিনি তাঁহার বুকের মাংস বিক্রয় করিয়া বৃথা

* সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥

নরকভোগে সম্মত হইবেন না। কন্যার মাতাও আঁচল পাতিয়া বসিয়া আছেন। যদি বর কিংবা বরপক্ষীয়েরা তাঁহাকে আঁচল ভরিয়া অর্থ দিতে না পারিল, তাহা হইলে তিনি তাঁহার আঁচলের ধন পরের হাতে তুলিয়া দিবেন কেন? কন্যার অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গও, এই সময়ে আপনা হইতেই, আত্মীয়তা প্রদর্শনের জন্য অধীর। কেন না, অর্থোপার্জ্জনের এই প্রকার সুযোগ ও শুভ-সংযোগ সকল সময়ে ঘটে কৈ। যদি বর এমন স্থলে সকলকেই কিছু কিছু দিয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে কন্যাকেও অর্থ কিংবা আভরণের উপহার দানে পরিতৃপ্ত করিয়া, কোন প্রকারে বিবাহটা সম্পাদন করিতে পারে, তাহা হইলে সে বিবাহের নাম আসুর বিবাহ। *

মনুর মতে এই প্রকার বিবাহ অসুরেরই যোগ্য। তবে মনুষ্যের মধ্যে ইহার আবার এত অধিক প্রচলন হইল কেন? অপিচ, বিবাহটা যদি আসুর নামে ব্যাখ্যাত হইল, তাহা হইলে এতৎ সম্পর্কে আসল অসুর বলিয়া গণ্য হইল কে? বর,—না কন্যার পিতা প্রভৃতি জ্ঞাতি-বর্গ? বরপক্ষ,—না কন্যাপক্ষ?

---

* জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥

গান্ধর্ব্ব বিবাহ * লালসা-জনিত প্রীতির ললিত-বন্ধন। উহাতে গো-মিথুনেরও কোন সম্পর্ক নাই, এবং কন্যার জ্ঞাতিদিগকে ধনের দ্বারা বশ করিয়া লওয়ারও কোন প্রসঙ্গ নাই। বর ও কন্যা পরস্পরের রূপ দেখিয়া পাগল, অথবা বিশেষ কোন গুণের আকর্ষণে উভয়ে উভয়ের জন্য বিহ্বল। সুতরাং এ রূপ স্থলে, বিবাহটা প্রায়ই গোপনে সম্পাদিত হইয়া থাকে, এবং গান্ধর্ব্ববিবাহের বর ও কন্যা, এই হেতুই, প্রায় সর্ব্বত্র, আপনাদিগের প্রণয়ের ইতিহাস লজ্জার আবরণে ঢাকিয়া রাখে।

কুলাচার্য্য ও কুল-পুরোহিত ঠাকুরেরা অবশ্যই গান্ধর্ব্ব-বিধানে নিতান্ত বিরক্ত। কারণ, তাঁহারা কণ্ঠকণ্ডূয়নের অসাধারণ জ্বালায়, অথবা কর-তলস্থ মুদ্রার ঝনৎকার-শ্রুতির প্রত্যাশায়, সাধারণতঃ যাহা যাহা করিয়া থাকেন, এ বিবাহে কোকিল ও দয়েল প্রভৃতি বনের বিহঙ্গই, বিনা লাভে ও বিনা লোভে, প্রায়শঃ তাহা সম্পাদন করে। আর, যাঁহারা ঘরের খাইয়া পরের উৎসবে উন্মত্ত,—হাতে আর কোন কাজ নাই বলিয়া সর্ব্বদাই পরের ক্রিয়াকর্ম্মে কার্য্যাধ্যক্ষরূপে ব্যাপৃত, তাঁহারাও

---

* ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥

এ পদ্ধতিতে নিতান্ত অপ্রীত। কেন না, এ বিবাহের আনন্দ-উৎসবে যাহা কিছু চাই, আকাশের চন্দ্র তারা এবং উদ্যানের তরু লতাই তাহার সমস্ত উপকরণ আপনা হইতে বিনা মূল্যে উপহার দেয়।

ভারতবর্ষের বীর ও বড় মানুষদিগের মধ্যে এক সময়ে, ব্রাহ্মবিবাহের পর, গান্ধর্ব্ববিবাহেরই একটুকু বেশী গৌরব ছিল, এবং তপোবনবাসিনী ঋষিকন্যাদিগের মধ্যেও অনেকে, পিতামাতার অগোচরে, গান্ধর্ব্ব ব্যবহারে, বরে আত্মদান করিয়া, উহার সে গৌরব বাড়াইয়া গিয়াছেন। দুষ্মন্তশকুন্তলার বিবাহ সর্ব্বাংশে গান্ধর্ব্ব, এবং উহা কণ্ব ও কশ্যপ প্রভৃতি মহামনস্বী মহর্ষিদিগেরও অনুমোদিত। কালিদাস এই দুষ্মন্ত শকুন্তলার বিবাহের কাহিনী লিখিয়াই জগতে অদ্বিতীয় কবিকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু, ইদানীং ব্রাহ্ম ও গান্ধর্ব্ব অপেক্ষা আসুর বিবাহেই লোকের অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং বিবাহের কথা ও বিষয়বাণিজ্যের কথা অনেক স্থলেই এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত শৈব-বিবাহও গান্ধর্ব্ববিবাহেরই আর এক নাম। কিন্তু, শৈব-বিবাহের নিগূঢ় উদ্দেশ্য তান্ত্রিক সাধক ভিন্ন অন্যের সুখবোধ্য নহে।

রাক্ষসবিবাহ,* এইক্ষণকার পিনালকোডের শাসনে, রাক্ষস ও অরাক্ষস সকলের পক্ষেই সমান পরিত্যজ্য। কন্যা, "হা তাত! হা ভ্রাতঃ! বলিয়া চীৎকার করিতেছে"; বর সে আলুলায়িত-কুন্তলা ভয়-বিহ্বলা কুলবালার তথাবিধ করুণবিলাপে কর্ণপাতও না করিয়া, বাহুবলে তাহাকে হরিয়া লইয়া যাইতেছে। শুধু ইহাই নহে, যাহারা সেই বিলপমানা বিপন্ন অবলার পরিত্রাণের জন্য সম্মুখীন হইতেছে, সে তাহাদিগকেও হত, আহত, কিংবা ভূপাতিত করিয়া, বাহুবলের বিজয়শঙ্খ বাজাইয়া, আপনার পথ দেখিতেছে। এইরূপ ত্রাহি ত্রাহি গোছের মুণ্ডচ্ছেদী তুণ্ডভেদী বিবাহ বল-দৃপ্ত দুর্ব্বৃত্ত এবং রাক্ষস-প্রতিম ব্যক্তিদিগের জন্য এক প্রকার মন্দ নহে। বোধ হয় দণ্ডকারণ্য ও দাক্ষিণাত্যের পুরাতন রাক্ষসদিগের মধ্যে এই প্রকার বিবাহেরই সমধিক প্রচলন ছিল। ইহাতে বীণা, বেণু ও মুরজ প্রভৃতি বিবিধ সুখাবহ যন্ত্রের মধুর ধ্বনির পরিবর্ত্তে, অস্ত্রঝন্ঝনার আতঙ্কজনক শব্দই অধিকতর পরিশ্রুত হয়, এবং আতর ও গুলাবের পরিবর্ত্তে মানুষের ছিন্ন-কণ্ঠ-নিঃসৃত রুধির-

---

* হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥

ধারাতেই বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা সকল লোকের ভাল লাগে না। অনেকে জ্ঞানানন্দ শর্ম্মার মত চিরজীবন অকৃতদার রহিতে প্রস্তুত, তথাপি এ রূপ উৎকট বিবাহের আশে পাশে যাইয়া অন্যের চিত্তে অণুমাত্রও কষ্ট দিতে, অথবা আপনি অনর্থক আপদ্‌গ্রস্ত হইতে অসম্মত।

মনু গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এই দুইকে মিলাইয়া মিশাইয়া গান্ধর্ব্ব-রাক্ষস নামে আর এক অভিনব মিশ্র বিবাহের* ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহাতেও বলপূর্ব্বক হরিয়া লওয়ার কথা আছে। কিন্তু, সে হরণ পূজার্হ আহরণের মত। উহা বীর-ধর্ম্মের বিচারে অযোগ্য অথবা অযশস্য, এবং প্রেম-ধর্ম্মের বিচারেও অপরাধজনক নহে। কারণ, কন্যা স্বয়ংই হৃতা হইবার জন্য লালায়িত। কৃষ্ণানুরাগিণী রুক্মিণী এই রূপে আহৃত হইয়া, শিশুপালের মত পশুর হস্ত হইতে, আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। সুভদ্রাহরণও উল্লিখিত রূপ গান্ধর্ব্ব-রাক্ষস বিবাহেরই আর একটি সুপ্রসিদ্ধ উদাহরণ। রাক্ষস শব্দে এ সকল স্থলে রক্ষক অর্থটিই অধিকতর পরিস্ফুট।

---

* পৃথক্‌পৃথগ্বা মিশ্রৌ বা বিবাহৌ পূর্ব্বচোদিতৌ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্ম্যৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ॥

মনুর তালিকায় পৈশাচ-বিবাহই * সকলের মধ্যে নিকৃষ্ট। তিনি উহাকে পাপিষ্ঠ ও অধম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং আমিও এই হেতুই উহার সবিশেষ বর্ণনে নিবৃত্ত রহিলাম। যে কথাটা কানে শুনিলেই শরীর শিহরিয়া উঠে, পাঠককে আবার তাহার বিশেষ অবস্থা বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাইয়া ফল কি? কিন্তু মনু যে প্রকার বিবাহকে পৈশাচ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ছাড়া, আরও অনেক প্রকার পৈশাচ-বিবাহ পৃথিবীতে নিত্য প্রত্যক্ষ হয় না কি? যাহারা বাহিরের মার্জ্জিত আবরণে মনুষ্য, কিন্তু প্রকৃতির অকথ্য নীচতায় পিশাচ,—যাহারা শতপ্রকার সুগন্ধিলেপে সুসিক্ত রহিয়াও, চক্ষের দৃষ্টি, মুখের কথা, এবং গায়ের গন্ধে পিশাচ বলিয়া ধরা পড়ে, তাহাদিগের পারিবারিক জীবনকে পৈশাচ-বিবাহেরই রূপান্তর বলিয়া বর্ণনা করিলে, নিতান্তই অসঙ্গত হইবে কি?

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে আরও দুই প্রকার বিবাহের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। সে দুইয়ের একটিকে

---

* সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোধমঃ॥

স্বয়ংবর এবং আর একটিকে শৌর্য্যবরণ বিবাহ বলিয়া বর্ণনা করিলে অসঙ্গত হইবে না।

স্বয়ংবর বিবাহে মেয়ের বড় সোহাগ। মেয়ে অবশ্যই অত্যন্ত সুন্দরী। নহিলে, দেশ দেশান্তরের পাত্র, বরবেশে সুসজ্জিত হইয়া,—যখন রেলের গাড়ীর সুদূর-কল্পনা কাহারও স্বপ্নেও প্রবেশ পায় নাই, এমন দিনে,—তখনকার সেই দুর্গম বর্ত্ম অতিক্রম করিয়া, মেয়ের পিতৃভবনের আশে পাশে আসিয়া উপবাসী পড়িয়া রহিতে সম্মত হইতেন না।

সমাগত পাত্রেরা অন্নাভাবে উপবাসী থাকিতেন, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা উপবাসী থাকিতেন উদ্বেল-হৃদয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে, অথবা অদৃষ্ট-পরীক্ষার অনিবার্য্য হাহুতাশে। ইহার পর, কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে বৃহৎ একটা সভা হইত। সভার নাম স্বয়ংবর সভা। আমন্ত্রিত পাত্রবর্গ সেই সভায় যাইয়া পৃথক্ পৃথক্ মঞ্চে অথবা পৃথক্ পৃথক্ আসনে উপবিষ্ট হইতেন; এবং যাঁহার বিবাহের জন্য এত ঘটা, তিনি তাঁহার রূপের ছটায় সকলের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগাইয়া, একটি প্রগল্ভবচনা বৃদ্ধা পৌর-অঙ্গনার সঙ্গে, সভার মধ্য-স্থল দিয়া, দেহবদ্ধ দামিনী কিংবা স্ফুটিত-পুষ্পাভরণা চলন্ত

লতার মত, চলিয়া যাইতেন। পরিণয়প্রার্থী পাত্রগণ তাঁহার দিকে চাহিতেন, তিনিও সলজ্জচকিত, সরোজ-চক্ষে তাঁহাদিগকে একটু একটু দেখিয়া লইতেন। সঙ্গিনী উপমাতা সে সময়ে একে একে প্রসিদ্ধ পাত্রগণের রূপ, গুণ ও সাংসারিক সুখ-সমৃদ্ধির বর্ণনা করিতেন; এবং কন্যা, তাহা কান ভরিয়া শুনিয়া, সে বর্ণনায় তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট না হইলে, পাত্রান্তরের সান্নিধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। পরিশেষে, যাঁহার রূপ তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিত, অথবা যাঁহার গুণ-গরিমার বর্ণনা তাঁহার প্রাণে ভাল লাগিত, তাঁহার গলায় ফুলের মালা দোলাইয়া দিয়া, উৎসবের হল-হলার মধ্যে ঘরে ফিরিয়া আসিতেন। সভাস্থ পাত্রদিগের মধ্যে এক জন ভিন্ন আর সকলেরই বেশ-ভূষা এবং উচ্ছলিত আশা তখন বিফল হইত। সেই ব্যর্থমনোরথ, বিষণ্ণ যুবাদিগের তদানীন্তন দুঃখের অবস্থা বুঝাইবার জন্য, পূর্ব্বতন স্বয়ংবর-বর্ণনার একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিব।

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ
যং যং ব্যতিয়ায় পতিংবরা সা।
নগেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে
বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ॥

অর্থাৎ,—

নিশীথে চলন্ত দীপ-শিখার আভায়,
ক্ষণ হাসি', রাজ-পথে, প্রাসাদ-নিচয়,
ডোবে অন্ধকারে ;
ত্যজি গেলা রাজ-বালা যাদেরে সভায়,
ডুবিল তেমতি সেই যুবরাজচয়
বিষাদ-আঁধারে ।

মনুর আট প্রকার বিবাহের মধ্যে স্বয়ংবর বিবাহের উল্লেখ নাই। কিন্তু, উহা গান্ধর্ব্ব বিবাহেরই প্রকারান্তর, অথবা নীরব-গান্ধর্ব্ব নামে নির্দ্দিষ্ট হইবার যোগ্য। গান্ধর্ব্ব বিবাহের মুখ্য কথা পরস্পর অনুরাগ। পাত্র যখন বর-বেশে সুসজ্জিত হইয়া, বিবাহের সভায় বসিয়া, ঔৎসুক্য দেখাইতেছেন, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, তিনি অনুরাগের টানে পড়িয়া আধ' পাগল হইয়াছেন। পক্ষান্তরে, কন্যাও যখন, সহস্রজনের মধ্য হইতে, এক জনকে তাঁহার প্রাণ-প্রিয় জ্ঞানে বাছিয়া লইতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাতে তিনি অনুরাগিণী। যাঁহারা স্বয়ংবর বিবাহকে নীরব-গান্ধর্ব্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে অসম্মত, তাঁহারা সম্ভবতঃ উহাকে একতরফা গান্ধর্ব্ব বলিয়া গ্রহণ করিতেও সম্মত হইবেন না। কেন না,

গান্ধর্ব্বের টান শাস্ত্রমতে দুই দিকে সমান। যদি স্বয়ংবর বিবাহ গান্ধর্ব্বের মধ্যে নিবেশিত হইতে না পারে, তবে উহা নিবিষ্ট হইবে কিসে?

শৌর্য্যবরণ বিবাহও কিয়দংশে স্বয়ংবরের মত। স্বয়ংবরে যেমন শত শত পাত্রের সমাগম হয়, শৌর্য্যবরণেও দেশ দেশান্তর এবং দিগ্‌দিগন্তর হইতে সুরূপ কুরূপ, সক্ষম ও অক্ষম, এবং সমৃদ্ধ ও দরিদ্র প্রভৃতি শত শত পাত্রের আগমন হইয়া থাকে। কিন্তু, স্বয়ংবরে বরণ করে কন্যা স্বয়ং,শৌর্য্যবরণে বরণ হয় বরের প্রত্যক্ষ কর্ম্মফলে। কন্যার পিতা মাতা, অথবা কোন কোন স্থলে কন্যা আপনি, বরের শৌর্য্য পরীক্ষার জন্য, কোনরূপ উৎকট প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দেন; এবং সমাগত পাত্রদিগের মধ্যে যিনি সে প্রতিজ্ঞার নিয়মানুমোদিত কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, পিতা মাতা তাঁহাকেই কন্যাদান করিয়া থাকেন, কিংবা কন্যা আপনিই তাঁহাকে বর-মাল্য দিয়া, পতিরূপে বরণ করেন।

অযোধ্যার লক্ষ্মী জানকীকে আজও লোকে ধনুকভাঙ্গা ধন বলিয়া আদরের ভাষায় বর্ণনা করে। কেন না, রঘু-কুল-তিলক শ্রীরামচন্দ্র, মিথিলাধিপতি জনকের হর-ধনু-ভঙ্গরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পরীক্ষায়, আপনার অপ্র-

তিম শৌর্য্যপ্রদর্শন করিয়া, জানকীকে লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতের মুখ্যতত্ত্বরূপিণী দ্রৌপদীও, প্রতিজ্ঞার নিয়মানুসারে, পাণ্ডবের সঙ্গিনী হইয়া, পিতার রাজ-প্রাসাদ ছাড়িয়া, এক কুম্ভকারের কর্ম্মশালায় আশ্রয় লইয়া ছিলেন। যে ধুরন্ধর পুরুষ, সেই লোক-সমুদ্রের মধ্যে ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া, দ্রুপদের প্রতিজ্ঞার অনুরূপ, লক্ষ্যভেদরূপ পরীক্ষা দ্বারা, আপনার অলৌকিক শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, কে তাঁহাকে অর্জ্জুন বলিয়া জানিত? দ্রৌপদীর চক্ষেও তিনি তখন এক দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণ। কিন্তু, দীন-দরিদ্র হইলেও তিনিই তাঁহার পতি এবং সুতরাং জীবনের গতি। তিনি যখন নিয়মানুসারে প্রতিজ্ঞাত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তখন তিনি রাজা হউন, কিংবা রাজ-পথের ভিখারী হউন, তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলায় এমন শক্তি কার?

স্বয়ংবর বিবাহে যে গান্ধর্ব্বভাবের একটুকু ছিটা ফোঁটা প্রক্ষেপ আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শৌর্য্যবরণে * সে ভাবের সুদূরসম্পর্কও পরিলক্ষিত হয় না।

* শৌর্য্যবরণে আগে শুধু ধনুর্ব্বিদ্যা অথবা রণ-নৈপুণ্যেরই পরীক্ষা হইত। কালক্রমে, সাধারণত বিদ্যাবুদ্ধি এবং বিচারনৈপুণ্যের পরীক্ষাও উহার অঙ্গীভূত হইয়াছিল।

ইহাকে তবে মনুসংহিতার ব্যবস্থানুসারে কোন্ প্রকারের বিবাহ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবে?

পৃথিবীর আরও অনেক প্রকার বিবাহ, মনুর লিখিত আট প্রকারের বহির্ভূত। অথচ, সে সকল বিবাহও সর্ব্বাংশে এবং সম্পূর্ণরূপেই বিবাহ-পদ-বাচ্য। কেন না, বিবাহে যাহা চাই, অর্থাৎ জীব-প্রবাহ, জীবনের সুখ-দুঃখ-প্রবাহ, এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ ও সম্ভাবনানুরূপ সংবাহ, সে সমস্তই ঐ সকল বিবাহে সমান লক্ষিত হইয়া থাকে। আমি এখানে দিঙ্মাত্র প্রদর্শনের জন্য তাদৃশ কএক প্রকার বিবাহের উল্লেখ করিব। যাঁহারা বাদার্থে পণ্ডিত, তাঁহারা মনুর ব্যবস্থা এবং বিবাহবিষয়ে পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা মিলাইয়া লইয়া বিচার করিতে পারেন।

১ম। সৈংহিক বিবাহ। সৈংহিক এই নামটি অবশ্যই সর্ব্বাংশে নূতন। এই প্রবন্ধে এই রূপ আরও অনেক নূতন নাম সংকলিত হইয়াছে। কিন্তু নাম নূতন বলিয়া বিবরণও নূতন নহে। বিবাহসংক্রান্ত যে সকল বিবরণ এই প্রবন্ধে এক একটি নামের বিষয়স্বরূপ বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহার সমস্তই বহুকালের পুরাতন বৃত্তান্ত। সুতরাং নামে কিছু আসে যায় না। বিবরণের প্রকার-ভেদ

লইয়াই প্রকৃত কথা। এখন সৈংহিকেরই কথা কহিব। উহা বহুসংখ্য অসভ্য জাতির মধ্যে বিশেষ প্রচলিত, এবং অসভ্যদিগের মধ্যে যাহারা বীর,তাহাদিগের চক্ষে নিতান্ত আদৃত। ইহার প্রধান লক্ষণ এই,—যুবতী যখন পরিণয়-যোগ্যা, তখন তাহার প্রণয়াভিলাষে দুইটি কি তিনটি বলিষ্ঠ যুবা তাহার পাশে পাশে বিচরণ করে, এবং কোন রূপ নির্জ্জন স্থানে, সুযোগ পাইলেই, যুবতীকে আপনাদিগের পৌরুষ দেখাইবার জন্য, আপনারা এক জনে আর এক জনকে সিংহের বিক্রমে জড়াইয়া ধরে। বলা বাহুল্য যে, এই রূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধে যাহার পরাজয় ঘটে, সে আপনা হইতেই, প্রাণের আশায় প্রণয়ের লালসা পরিত্যাগ করিয়া, এক দিকে সরিয়া পড়ে, এবং যুবতী জয়শীল পুরুষকেই সর্ব্বতোভাবে পতি জ্ঞান করিয়া, নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করে।

সিংহীর সিংহলাভও ঠিক এই পদ্ধতিতেই সংঘটিত-হয়। সিংহী বনের মধ্যে, কোন রূপ ঝোপের আ-ড়ালে, অলস-মধুরা মানিনীর মত, এলায়িত ভাবে, নীরবে বসিয়া দেখে; এবং দুইটা প্রমত্ত সিংহ, নখরে ও দন্তপ্রহারে, একে অন্যের প্রাণ লইয়া, সেই এক ভয়ঙ্কর খেলায় প্রমত্ত রহে। দুইয়ের মধ্যে যেটা জয় লাভ

করিয়া রণ-ভূমি অথবা বন-ভূমিকে সিংহনাদে কাঁপাইয়া তুলে, সিংহী আর এদিকে ওদিকে না চাহিয়া তন্মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার সঙ্গে চলে।

পাঠক অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, রাক্ষসবিবাহের নির্দ্দয় কন্যাহরণ কিংবা কন্যাপক্ষ-নির্ঘাতন, এবং সৈংহিকের শৌর্য্যপ্রদর্শন, উদ্দেশ্য ও পরিণামে, বড়ই পৃথক। সৈংহিক বিবাহের সহিত বরং শৌর্য্যবরণ বিবাহেরই কতকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু, যাঁহারা পৃথিবীতে দয়াধর্ম্ম ও পৌরুষী শক্তির আশ্রয়স্বরূপ প্রকৃত শূর বলিয়া পূজা পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের ইহাতে লজ্জিত হইবার বিষয় কি? পুরুষের মধ্যে অনেকে যখন, প্রেমের প্রসঙ্গে, চকোর ও চাতকের সঙ্গে নিজ নিজ পিপাসু প্রাণের তুলনা করিয়া, প্রীতি লাভ করেন, তখন যে সকল পুরুষ-সিংহ পৃথিবীতে একটুকু উচ্চ পদবীরূঢ় বলিয়া দশ জনের মধ্যে গণ্য মান্য, তাঁহারা যে, সৈংহিক বিবাহের সার রসটুকু আকর্ষণ করিয়া, শৌর্য্যবরণপ্রথায় অনুরাগী হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি?

২য়। মাযূরিক বিবাহ।—ইহাতে মৃগেন্দ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী মৃগেন্দ্রের নখ-দন্ত-প্রহার-লক্ষিত মহাযুদ্ধের কোন সম্পর্ক নাই,—তর্জ্জন নাই, গর্জ্জন নাই, তরু

লতার নিষ্পেষণ নাই, আছে শুধুই ময়ূরের মোহন নৃত্য, মনোমোহন ঠাম। ময়ূর যেমন ময়ূরীর মন ভুলাইবার জন্য, পাখা ছড়াইয়া, পেখম ধরিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করে, মায়ূরিক বিবাহের বরও, মাথায় বিবিধ বিহঙ্গের বর্ণবিচিত্র পক্ষরাজিতে বিভূষিত হইয়া, কটিতে কাঁচের মালা পরিয়া, করে ঢাল ও বড়শা ধারণ করিয়া, পাত্রীর সান্নিধ্যে, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কোন দিবসে, বরবেশে নাচিতে প্রবৃত্ত হয়। পাত্রী লজ্জায় নম্রমুখী। সে যাহা কিছু দেখে, তাহা অবনত চক্ষে; যাহা কিছু কহে, তাহা সমানবয়স্কা সখীর মুখে। পাড়ার মেয়েরা তাহারে ঘেরিয়া বসে, বর তাহার কাছে নাচিয়া নাচিয়া, যেন সে নৃত্যের ভঙ্গিতে তাহার হৃদয় যাচিয়া, আপনার গ্রীবা, বক্ষ ও বাহু প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভা প্রদর্শন করিতে রহে।

পাত্রী, কখনও কখনও প্রৌঢ়ার মত লজ্জার সমস্ত শাসন পাসরিয়া, বরকে তদীয় পৃষ্ঠপ্রদর্শনের জন্য ফিরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে উপদেশ করে; এবং বরও সেই মুহূর্ত্তেই আদিষ্ট প্রণালীতে পৃষ্ঠের পরিপুষ্টি দেখাইয়া, অধিকতর উৎসাহের সহিত নাচিতে থাকে। যখন বরের তাদৃশ নৃত্যদর্শনে পাত্রীর মন ও প্রাণ উথলিয়া উঠে, তখন

সে সখীদিগের সঙ্গ ছাড়িয়া, দৌড়িয়া, গৃহান্তরে চলিয়া যায়, এবং পাড়ার মেয়েরা ও অন্যান্য পৌর-জনেরা তাহার পিছু পিছু ধাবিত হয়। পাত্রীর অবস্থা তখন কতকটা জুরিপতির অবস্থার মত। কারণ, তখন তাহার মুখে যাহা বাহির হইবে, বেচারা পাত্রের অদৃষ্টফল-বিচার সম্বন্ধে তাহাই চরম নিষ্পত্তি।

আফ্রিকার অনেক অসভ্য জাতি উল্লিখিতরূপ মায়ূর বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী। তাহারা, পাত্রীর গৌরব রক্ষার্থ তদীয় পিতা মাতাকে, আর্ষপ্রথার অজ্ঞাত অনুকরণে, চারি পাঁচটি গোরু প্রীতির উপহার স্বরূপ দিয়া থাকে। পাত্রী যদি বড় রূপসী হয়, তাহা হইলে গোরুও অবশ্যই বেশী দিতে হয়। এইরূপ আদান প্রদানে তাহাদিগের নিন্দা নাই.; বরং প্রশংসা আছে। বরের এই প্রশংসা যে, সে বেশী দিতে পারিল; কন্যার এই প্রশংসা যে, সে বেশী পাওয়ার যোগ্য হইল।

উল্লিখিত অসভ্যেরা বহুবিবাহেও অনুরক্ত। যে অন্ততঃ দুই তিনটি বিবাহ করিতে অসমর্থ, তাহার স্ত্রী, দরিদ্রের গৃহিণীর ন্যায়, সকল সময়েই দশ জনের কাছে ম্লান-মুখী। কেন না, তাহার স্বামীকে সে বই

আর কেহ আদর করিল না। কিন্তু এই বহুবিবাহ এবং কন্যার বিনিময়ে বহু গো-দান সত্ত্বেও, বর-নির্ব্বাচনরূপ মুখ্যকার্য্য মায়ূর-বিবাহের প্রাকৃত পদ্ধতিতেই সম্পাদিত হয়। হা ময়ূর! মনুষ্য কত স্থানে, কত প্রকারে, তোমার মনোহর নৃত্যের অনুসরণ করিয়া, জীবনে কৃতার্থ হইবার জন্য, আজও যত্নশীল হইতেছে, তাহা কি তুমি জান? জানিলে বোধ হয়, তুমি কখনও তোমার ঐ প্রিয়রঞ্জন পেখম ছাড়িয়া, পায়ের দিকে চাহিয়া, বিষাদে মলিন হইতে না।

৩য়।—মৃগয়িক বিবাহ। ইহাতে সৈংহিকের সাহসিকতা আছে, রুধির-ধারা নাই; মায়ূরিকের মধুরতা আছে, নৃত্যের কোন অবকাশ নাই। এইরূপ বিবাহ আসিয়ার মধ্যখণ্ডবাসী তুরঙ্গবিলাসী তুর্কমান ও তাতারদিগের মধ্যেই অধিক প্রচলিত। ইহার বর ও কন্যা উভয়েই, রজঃপুত যুবক যুবতীর ন্যায়, অশ্বারোহণে পটু। বর ও কন্যার পিতামাতার মধ্যে বিবাহের কথা চলিলে, এক দিন বহু লোকের জ্ঞাতসারে, গ্রামের অদূরে, বড় একটা প্রান্তরে, ঘোড়দৌড় দেখার মত বৃহৎ ঘটা হয়। দেশের দুগ্ধ-পোষ্য শিশু অবধি দুলিত-চর্ম্মা বৃদ্ধপর্য্যন্ত অসংখ্য লোক, সেই ঘটা দেখিবার জন্য, প্রাতঃসময় হইতে ক্রমে

ক্রমে সেই মাঠের চারি দিকে আসিয়া জড় হইতে থাকে।

ইহার কিছু ক্ষণ পরেই, সাত আটটি সুসজ্জিত যুবতী, বড় বড় তেজস্বী ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া,—যেন শক্তি ও সৌন্দর্য্যের সম্মিলিত মাধুর্য্যে দর্শকবৃন্দের চক্ষে চমক লাগাইয়া, সেই প্রান্তরের এক প্রান্তে আসিয়া দেখা দেয়। বিবাহের কন্যাও ঐ সাত আটটির মধ্যেই একটি। অন্যেরা তাহার মর্ম্মসুখের অংশিনী নর্ম্মসখী। কিন্তু কন্যাকে চিনিয়া লইবে কি প্রকারে? সকলেরই সমান রূপ, সমান বয়স, আজি বিবাহের উৎসবে সমান সাজসজ্জা,—করে চারুদৃশ্য চাবুক, কপোলে নিবিড়-কৃষ্ণ ভ্রমর-পংক্তির ন্যায় মৃদুল দোলায়িত চূর্ণকুন্তল, অধরে হাসি, নয়নে ঔৎসুক্য এবং সমস্ত মুখচ্ছবিতে লজ্জার অরুণরাগ। তাই বলিয়াছি, যেটি বিবাহের কন্যা, তাহাকে চিনিয়া লইবে কি প্রকারে? চিনিবার এক বিচিত্র চিহ্ন আছে। কন্যার কোলে একটি সদ্যোমৃত মৃগ-শিশু। বঙ্গের কোকিল-কবি, গুণাকর ভারত তদীয় নায়িকার রূপবর্ণনায় কহিয়া গিয়াছেন,—

"কাড়ি নিল মৃগ-মদ নয়নহিল্লোলে,
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ ল'য়ে কোলে।"

যদি এখনকার কোন নূতন গায়ক মৃগয়িক বিবাহের

এই মধুর কাহিনী ভারতের কণ্ঠানুকরণে কবিতায় গাই-
তেন, তাহা হইলে তিনি হয় ত কহিতেন,—

মৃগ-শিশু কোলে ঢাকি মধুর সোহাগে,
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ,
হাসে অকলঙ্ক চাঁদ,
পার যদি ধর গিয়া নব অনুরাগে,
—পারিলে কাড়িয়া নেও মৃগ-শিশু আগে।

কন্যার কোলে, নেতের অাঁচলে, মৃগ-শিশুর মৃত-দেহ
ঢাকা রহিয়াছে। সেটিকে কাড়িয়া নিতে পারিলেই
বিবাহ সিদ্ধ হইল। কিন্তু, সে অশ্বারূঢ়া অবদ্ধকুন্তলা
বিদ্যাধরীর অঙ্ক হইতে, তাহার অঙ্কের ধন কাড়িয়া
নেওয়া যে সে যুবার কার্য্য নহে।

কন্যা যেমন সখীমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া, হাতে চাবুক
লইয়া, অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া, আড়নয়নে এদিক ওদিক চাহিয়া
দেখিতেছে, বরও সেইরূপ, সেই প্রান্তরেরই আর এক
স্থানে; সমানবয়স্ক যুব-জনে পরিবৃত হইয়া, অশ্বপৃষ্ঠে
থাকিয়া, বৃদ্ধদিগের ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিতেছে। যেই
সেই ইঙ্গিত পরিব্যক্ত হইল, কন্যার দল অমনি, তীর,
তারা ও উল্কাপাতকে অবজ্ঞা করিয়া, তড়িদ্বেগে ছুটিল,
এবং বরপক্ষও ততোধিক উদ্যমে,—ততোধিক উৎসাহে,

ঘোড়া চালাইল। যখন বর যাইয়া কন্যাকে ধরিয়া তাহার কোলের সেই মৃগ-শিশু কাড়িয়া লইল, তখন চারিদিকে জয়ধ্বনি পড়িল, এবং বিবাহের প্রাথমিক অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইয়া গেল।

যাঁহারা বঙ্গদেশে বরবেশে অলঙ্কৃত হইয়া, বুকে চুলের চেইন আর ফুলের মালা দোলাইয়া, রূপের বাহার দেখাইয়া থাকেন, তাঁহারা এই রূপ বিবাহে অগ্রসর হইতে সম্মত হইবেন কি না, সে বড় কঠিন সমস্যা। যে সকল যুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ পরীক্ষায় উচ্চ শ্রেণির "পাঁশ" বলিয়া পুরমহিলাদিগের কাছে বিখ্যাত, তাঁহারাও হয়ত মৃগয়িকবিবাহের কথা শুনিলেই মাথা নোয়াইয়া বসিয়া থাকিবেন। কারণ, এ পরীক্ষা শিকলি-বান্ধা টিয়া কিংবা পিঞ্জর-রুদ্ধ পাহাড়িয়া ময়নার মুখস্থ পাঠের পরীক্ষা নহে।

যে স্থান হইতে বসন্তের বিনোদ-সমীর প্রবাহিত হয়, সেই চির-মনোহর মলয়-দ্বীপে এবং আরও কোন কোন রমণীয় উপদ্বীপে অশ্বারূঢ়া সুন্দরীর সঙ্গে এই রূপ ঘোড়-দৌড় পরীক্ষার প্রথা আছে। সুন্দরী ঘোড়ায় চড়িয়া এক দিকে উড়িয়া যায়, বরও তাহার আঁচল ধরিবার জন্য আকুল হইয়া আপনার ঘোড়ায় উন্মত্তের মত

চাবুক লাগায়। কোন কোন জাতির মধ্যে, কন্যা ঘোড়ায় উঠিতে সাহস না পাইয়া পদ-ব্রজে পলায়ন করে, এবং বনে কিংবা উপবনে লুকাইয়া থাকে; বর তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য, ঝোপে ও জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অথবা গ্রামের নিকটবর্ত্তি বনের মধ্যে দৌড়িয়া দৌড়িয়া, পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু, মৃগ কাড়িয়া লইবার প্রথাটা শুধু মধ্য আসিয়াতেই দৃষ্ট হয়।

এ মৃগরিক বিবাহ, মনুর মতে, কোন্ নম্বরের অন্তর্গত হইবে? ইহাকে গান্ধর্ব্ব বলিতে পারি না। কেন না, কন্যা ধরা পড়িবার আগে বরে অনুরাগিণী হয় না। অপিচ, যদি সে অশ্বরজ্জু শ্লথ করিয়া আপনা হইতে ধরা দেয়, তাহা হইলে সমানবয়স্কা যুবতীদিগের মধ্যে তাহার নিন্দার আর পরিসীমা থাকে না।

৪র্থ। মদিরিক বিবাহ।—মদিরেক্ষণার পীতাবশিষ্ট পিয়ালা হইতে, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের সান্নিধ্যে, মদিরারূপ মহাপ্রসাদ গ্রহণই এ বিবাহের মূলমন্ত্র অথবা মুখ্য কার্য্য। বিবাহের এ প্রথা ভারতের প্রান্তস্থিত পর্ব্বতবাসী বহুসংখ্য জাতির মধ্যে বিশিষ্টরূপে সম্মানিত। ইহার অভ্যন্তরে অবশ্যই অনুজ্ঞাত গান্ধর্ব্বের বিশেষ গন্ধ আছে। কেন না, বর ও কন্যার মধ্যে পরস্পর

অতি প্রবল অনুরাগের পূর্ব্বলক্ষণ প্রস্ফুট না হইলে, পরিবারস্থ আর কেহই বিবাহের কথা মুখে আনে না।

যখন পিতা মাতা, কোথাও সে অনুরাগের অশিষ্ট, কোথাও বা বিশিষ্ট পরিচয় পায়, তখন তাহারা একটি দিন নিরূপণ করিয়া, প্রণয়-লোলুপ বর, বরের আত্মীয় স্বজন এবং পাড়ার দশ জনকে আমন্ত্রণ করিয়া বাড়িতে লইয়া আইসে। সকলে যে সময়ে সভা করিয়া উপবিষ্ট হয়, বিবাহের কন্যা সেই সময়ে, খোপায় বন-ফুলের মালা পরিয়া, অধর-প্রান্তে অনল্পবিকসিত বন-ফুলের মধুর হাসি হাসিয়া, জননীর ইঙ্গিতক্রমে, বরের উৎসঙ্গে যাইয়া উপবেশন করে। ইহার পর জননী এক পিয়ালা মদিরা আনিয়া কন্যার হাতে তুলিয়া দেয়। কন্যা বরের বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির সহিত আপনার দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিটি ভঙ্গিক্রমে জড়াইয়া ও মোড়াইয়া, লজ্জায় যেন মাথা নোয়াইয়া, সমাগত প্রাচীনাদিগের উপদেশক্রমে, আগে আপনি একটু খায়, এবং যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা বরকে আদর করিয়া দেয়। বর সে প্রসাদপানে প্রীত ও কৃতার্থ হইয়া,—তাহার সে নবোঢ়া যুবতীরে তখনই সঙ্গে লইয়া;—উপস্থিত অভিভাবকবর্গের পায়ে লুটাইয়া পড়ে।

এ ভূমিলুণ্ঠন নিশ্চয়ই হৃদয়ের আনন্দ-জনিত; মদিরার উত্তেজনা-জনিত নহে। কেন না, পরিণয়বন্ধনের প্রথম পিয়ালায় বেশী মদিরা দেওয়ার প্রথা নাই। কিন্তু বিবাহটি তথাপি মদিরিক বলিয়াই বর্ণিত হইবার যোগ্য। কারণ, বর ও কন্যা যতক্ষণ ঐ রূপ এক পিয়ালায় মদিরা পান না করে,ততক্ষণ তাহারা পতি পত্নী, এবং এক পরিবার কিংবা এক 'কিলি' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মদিরিক বিবাহও মনুর তালিকার বহির্ভূত। মনুর প্রমত্ত পৈশাচিক, প্রণয়-প্রমোদময় মদিরিক বিবাহ হইতে সর্ব্বথা পৃথক্।

৫। পৈষ্টিকবিবাহ।—এটি বড় সুন্দর। ইহা মদিরিক বিবাহেরই আর এক মূর্ত্তি। মদিরিক বিবাহে মুখে তুলিয়া দিতে হয় একটুকু মদ্য; পৈষ্টিকবিবাহে মুখে তুলিয়া দিতে হয় একটু সুমিষ্ট পিষ্টক। এ পদ্ধতিটা বহিঃস্থ লোকদিগের প্রীতিকর হউক আর না হউক,বর ও কন্যার অবশ্যই নিতান্ত প্রীতিপ্রদ। বর ও কন্যা যদি বয়সে নিতান্ত কাঁচা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের পক্ষে ইহা মুকুলিত-প্রীতির এক অপূর্ব্ব মহোৎসব। শাস্ত্রে আছে,—

"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং;
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।"

অর্থাৎ,—

কন্যার কামনা রূপে, মাতা খুঁজে ধন,
বরে পিতা খুঁজে জ্ঞান,
—জ্ঞাতি-বন্ধু কুল-মান ;—
শুধুই মিষ্টান্নে রহে ইতরের মন।

এ বিবাহে সে মিষ্টান্নের ভাগটা বর ও কন্যার মধ্যে। বীর-চূড়ামণি রোমান জাতিই পৃথিবীতে উল্লিখিত রূপ বিবাহের প্রথম প্রবর্ত্তক। পুরাতন রোমানদিগের মধ্যে তিন প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল।* একটা অতিজঘন্য আসুরিক। তাহাতে কন্যাকে গোরু বাছুরের ন্যায় রীতিমত খরিদ করিয়া লওয়া হইত। আর একটা ব্যবহার-সিদ্ধ। যাহারা স্বামী স্ত্রীর ন্যায় বার মাস একত্র বাস করিত, সমাজেও তাহারা শেষে স্বামী স্ত্রী বলিয়াই

---

* "The three primitive modes of marriage were Confarreatio, Coemptio in manum, and Usus.

* * * *

"The first was a religious ceremony before ten witnesses, in which an ox was sacrificed and a wheaten cake broken and divided between the spouses by the priest," The Roman Law.

পরিগণিত রহিত। তৃতীয় পৈষ্টিক, এবং এই পদ্ধতিই সম্মানে প্রথমস্থানীয়। বর ও কন্যা এই পদ্ধতির বিবাহে দশটি সাক্ষীর চক্ষের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া এক সঙ্গে একটি পিঠা খাইত, এবং পিঠা খাওয়াটা হইয়া গেলেই, তাহারা বিবাহশৃঙ্খলবদ্ধ দম্পতির ন্যায় সকলের কাছে বিশিষ্ট সম্মান পাইত। কিন্তু উল্লিখিত পিঠা ভবানন্দ মজুমদারের বাড়ির—

"চুষি রুটি রামরোট মুগের সামুলী
কলাবড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজা পুলী"—

অথবা ঐরূপ কোন উপাদেয় সামগ্রী নয়। পিঠার উপকরণ সামান্য কিঞ্চিৎ গম আর লবণ ও জল। যে বিবাহে এমন কদর্য্য পিষ্টকেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, সে বিবাহের বর ও কন্যা প্রেমের রস-মাধুর্য্য শিক্ষা বিষয়ে প্রথমেই কোন সুযোগ পাইত কি না, তাহা সংশয়ের বিষয়। নাবাজো প্রভৃতি অসভ্যদিগের মধ্যে অদ্যাপি বিবাহে শুধু এই পিষ্টকভক্ষণের অনুষ্ঠানই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মনুর তালিকায় পৈষ্টিকেরও স্থান নাই।

৬ষ্ঠ। তাম্বূলিক বিবাহ।—ইহাও সর্ব্বাংশেই মদিরিক পদ্ধতির অনুকৃতি। কন্যার জন্য বরনির্ব্বাচন করে পিতা মাতা, এবং উৎসবের জন্য যাহা কিছু আয়োজন

চাই, তাহাও পিতা মাতাই সংগ্রহ করিয়া থাকে। তার পর, বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের সকলে যখন কন্যার পিতৃগৃহে প্রফুল্লচিত্তে উপবিষ্ট হয়, কন্যা তখন আধ' ধরাধরি অবস্থায়, বরের কাছে আনীত হইয়া, চারিদিকের সানন্দ কোলাহলের মধ্যে, তাহার হাতে তাম্বূল তুলিয়া দেয়। সে তাম্বূলও, রোমানদিগের পিষ্টকের ন্যায়, সম্ভবতঃ নিতান্তই প্রীতিশোষক ও পিত্তবর্দ্ধক। ইহা নিঃসংশয়ই বলা যাইতে পারে যে, উহা কোন অংশেও "মিঠা পান—মিঠা গুয়া" এবং কেয়া খর ও পাথরিয়া চূণের মিশ্রণ-জনিত কোন মনঃপ্রিয় বস্তু নহে। কিন্তু দেশাচারের চির-পূজিত প্রথানুসারে ঐ তাম্বূলদানই তনু-মন ও প্রাণ দানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এবং নব-গিনির বহু জাতির মধ্যে শুধু উহাতেই পরিণয়ের চরম সমাধান। মনুর তালিকায় তাম্বূলিক বিবাহেরও উল্লেখ নাই। থাকুক বা নাই থাকুক, যখন এ তাম্বূলিক পদ্ধতিও বিবাহের অনন্ত পদ্ধতির মধ্যে একটা বলিয়া পরিচিত, তখন যার তার হাতে, হাতে হাতে, তাম্বূল দান করা কর্ত্তব্য কি না, তীব্রদর্শনা নব্য ললনারা তাহার বিচার করিবেন।

৭ম। তাণ্ডুলিক বিবাহ।—ইহার নামটা তাম্বূলিকের মত শ্রুতিমধুর হইলেও অনুষ্ঠানটা মোটের উপর

অতি নীরস। উড়িষ্যা প্রদেশে যুয়ঙ্গ নামে এক জাতি আছে। তাহারা ধর্ম্মে সূর্য্যোপাসক, জীবনের নিত্য-কর্ম্মে ভার-বাহক। তাণ্ডুলিক বিবাহের প্রণালীটা তাহাদিগের মধ্যেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কন্যা তাহাদিগের মধ্যে বরের কোন খবর লয় না। কিন্তু, বর মনোমত কন্যার অন্বেষণে, এখানে ওখানে, কিছু কাল ঘুরিয়া বেড়ায়। যখন স্বজাতীয় কোন পাথুরে পুতুল তাহার প্রাণে বড়ই প্রীতিকর বোধ হয়, তখন সে তাহার অভিভাবকদিগের নিকট সে কথা প্রকাশ করে। অভিভাবকেরা বরের মনোগত ভাব বুঝিতে পাইয়া, ঘটকতার জন্য কন্যার পিতৃগৃহে যাইয়া উপস্থিত হয়, এবং কন্যার পিতা মাতা প্রস্তাবিত বিবাহে প্রীতির সহিত সম্মত কি না, কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া লয়।

বিবাহের নিরূপিত দিবসে বর কন্যার পিতৃগৃহে আইসে না ; বরপক্ষীয়েরা ঘটার সহিত আসিয়া কন্যাকে বরের গৃহে লইয়া যায় ; এবং ঐ রূপ লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, কন্যার কাছে বরের উপহার বলিয়া, অল্প কিছু তণ্ডুল মাপিয়া দেয়। বরের সে তণ্ডুলগ্রহণই, এ বিবাহে, পতিত্বের বরণ। যে এত ক্ষণ ঘরের কন্যা ছিল, সে উল্লি-খিত রূপ তণ্ডুল গ্রহণের পরক্ষণ হইতেই পরের পত্নী হইল,

এবং পত্নী সাজিয়া জন্মের মত পরের ঘরে চলিল। বিবাহের আর কিছু বাকী রহিল না।

বরের গৃহেও সে দিন আহারাদির ঘটা ও নৃত্যগীতের উৎসব ভিন্ন বিবাহের আর কোন অনুষ্ঠান নাই। গৃহে নব-বধূর সমাগম হইলে বাড়ির সকলে যে রূপ আমোদ লইয়া অধীর রহে, বরের পিতা মাতা এবং আত্মীয় স্বজনেরাও সে দিন শুধু সেই রূপ আমোদ লইয়াই আত্মবিস্মৃত। কেন না, বিবাহের ভাবনা পূর্ব্বেই চুকিয়া গিয়াছে। কন্যা যে বরের তণ্ডুল গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতেই বিবাহ সিদ্ধ হইয়াছে, এবং সে শুভসংবাদ পূর্ব্বেই বাড়িতে পৌঁছিয়াছে। এখন বাকী কেবল আমোদ-আহ্লাদ ও নৃত্যগীত।

কন্যার পিতা মাতা এবং ভাই ভগিনীরাও বিবাহের দিবস কন্যার সঙ্গে সঙ্গে বরের গৃহে অবস্থান করে, এবং সেখানকার নৃত্যগীতে দশ জনের সঙ্গী হইয়া কন্যার সহিত সম্বন্ধচ্ছেদের দুঃখটা ভুলিয়া রহে। যখন সে সুখের নিশা সুপ্রভাত হয়, তখন বর, তাহার বাসর-গৃহ হইতে বাহির হইয়া, শ্বশুর শাশুড়ীকে তিন পাত্র তণ্ডুল দিয়া বিদায় করিয়া দেয়।

বিবাহের আরম্ভে তণ্ডুল, উপসংহারেও তণ্ডুল ; সুতরাং

ইহা সর্ব্বতোভাবেই তাণ্ডুলিক। যাঁহারা মনুর টীকা টিপ্পনী লইয়াই ব্যাপৃত, তাঁহারা হয় ত তাণ্ডুলিক বিবাহকেও আসুরিক বিবাহেরই আর একটা নাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করিবেন। কিন্তু, আসুরিক বিবাহের অযশস্য ও অধর্ম্ম্য অর্থদান, আর তাণ্ডুলিকের নিয়মবদ্ধ তণ্ডুলপ্রদান প্রকৃতপ্রস্তাবে এক কথা নহে। কারণ, কন্যাকে অন্ন আর বস্ত্রদ্বারা আদর করা, বিশেষ দুই এক প্রকার ছাড়া, সাধারণতঃ সকল প্রকার বিবাহেরই অঙ্গস্বরূপ। অপিচ, কন্যা কিংবা কন্যার পিতা মাতাকে বিবাহের সময় কোন রূপ উপকার করিলে, অথবা কোন বস্তু উপহার দিলে, সে উপকার কিংবা প্রীতি ও শ্রদ্ধার সে সামান্য উপহারও যদি আসুরিক অনুষ্ঠানের অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর অধিকাংশ বিবাহই আসুরিক।

৮ম। সৌত্রিক বিবাহ।—এই বিবাহের মুখ্য অনুষ্ঠান, বর-কন্যার হস্তে, মস্তকে কিংবা গ্রীবাদেশে, সূত্রবন্ধন। কথিত সূত্র কোথাও শ্বেত, কোথাও পীত এবং কোথাও বা লোহিত। কিন্তু বর্ণ আর উপাদান যাহাই হউক না কেন, সূত্রের মহিমা বড় বেশী। পিতা মাতা কিংবা পুরোহিত যখন বর ও কন্যাকে হাতে হাতে কিংবা গলায় গলায় এক সুতায় বন্ধন করে, তখন সক-

লেরই মনে স্বভাবতঃ নানাবিধ মধুর ভাবের সঞ্চার হইতে থাকে। মনে লয়, বুঝি দুইটি প্রাণ, দুটি পক্ষীর মত, দুই দিকে উড়িয়া যাইতেছিল; কেহ তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া, এক সুতায় বাঁধিয়া, এক পিঞ্জরে ভরিয়া রাখিল। বস্তুতঃ, বিবাহের সহিত বাঁধাবাঁধির যদি বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে সৌত্রবন্ধনের সুখময় দৃশ্যটি সর্ব্বাংশেই সার্থক।

খিয়ংথ প্রভৃতি অশিক্ষিত বৌদ্ধদিগের বিবাহ-উৎসবে সূত্রবন্ধনই প্রধান কার্য্য। এখানে খিয়ংথ বিবাহের সামান্য একটুকু বিবরণ দিব। বর যুবা, কন্যা যুবতী; তথাপি বরের জন্য কন্যা এবং কন্যার জন্য বরনির্ব্বাচনের ভার পিতা মাতার হস্তে। যখন দুই দিকের সমস্ত কথা সুস্থির হয়, তখন বর, "শুভ দিনে" ও "শুভ ক্ষণে" কন্যার গৃহাভিমুখে শুভযাত্রা করে। বরের আগে ও পাছে দামামা ও দগড় বাজে। বর, সেই বাদ্যকোলাহলের মধ্যে, পিতা মাতা এবং বহুসংখ্য সুহৃৎ স্বজনের সঙ্গে পদ-ব্রজে চলিতে থাকে। কন্যাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে বাড়িতে লইয়া যাওয়া খিয়ংথদিগের রীতি নহে। কন্যার বাড়িতে যাইয়া বিবাহ করাই তাহাদিগের কুল-প্রথা। সুতরাং কন্যার পিতৃভবনেই বিবাহের বিশেষ আড়ম্বর।

বরের পিতা যেমন তাহার বন্ধুবান্ধব যুটাইয়া, বর ও বরযাত্রীদিগকে বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া, ঘটা করিয়া আসিতেছে; কন্যার পিতাও সেই রূপ তাহার কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীদিগকে আমন্ত্রণপত্রদ্বারা বাড়িতে আনিয়া, ঘটার সহিত প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রামের স্থানে স্থানে বাঁশের মাঁচা উঠিয়াছে। বরযাত্রীরা সে সকল মাঁচায় বাসা লইবে। বরের জন্য একটি পৃথক্ মঞ্চ প্রস্তুত হইয়া, তাহা নানা রঙের ফুলের মালা ও নানা প্রকার লতায় পাতায় সজ্জিত হইয়াছে। সকল মঞ্চেই প্রাথমিক জলযোগের সুন্দর আয়োজন আছে। বর ও বরের পিতা মাতা প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সেই মঞ্চে অবস্থিত রহে, এবং কন্যাপক্ষের প্রধান ব্যক্তিরা সেখানে যাইয়া তাহাদিগের অভ্যর্থনা করে।

বিবাহটা গোধূলি লগ্নে। আকাশে যখন দুই একটি করিয়া নক্ষত্র ফোটে, কন্যাপক্ষীয়েরা বরকে তখনই অন্তঃপুরে লইয়া যায়, এবং পুরোহিত বর ও কন্যাকে একটি পল্লবাচ্ছাদিত পূর্ণকুম্ভের সম্মুখে মুখামুখি দাঁড় করাইয়া, তাহাদিগের উভয়ের মুখে সাত বার সাত মুষ্টি অন্ন দেয়, আর এক গাছি নূতন সূত্রদ্বারা তাহাদিগকে সাত বার বাঁধে।

যখন পুরোহিত আছে, তখন অবশ্যই মন্ত্র আছে। কিন্তু বৌদ্ধদিগের বিবাহের মন্ত্র পালি ভাষায়। তাহা না বুঝে পুরোহিত, না বুঝে বর-কন্যা, কিংবা তাহাদিগের পিতা মাতা। মন্ত্র বুঝা দূরে থাকুক, অধিকাংশ পুরোহিত মন্ত্রের প্রকৃত শব্দগুলিও কোন দিন কানে শুনে নাই। তাহারা এই হেতু, মন্ত্র পাঠের জন্য প্রয়াসপর না হইয়া, বর ও কন্যাকে সূতায় জড়াইবার সময়, শুধুই ঠোঁট নাড়িয়া থাকে। যাহাদিগের বিবাহ, তাহারা এই মাত্র বুঝে যে, ঐ সূতার বাঁধে গলায় গলায় জড়িত হইলেই, তাহারা সাংসারিক জীবনের সুখ-দুঃখে স্বামী স্ত্রীর দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্রে জড়িত হইল।

চাকমাদিগের বিবাহ, আরম্ভে আসুরিক এবং উপসংহারে পৈষ্টিক হইলেও, মূলে সৌত্রিক বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। কারণ, উহাদিগের মধ্যে বর ও কন্যার শরীরে, সূতার অনুকল্পে, এক টুকরা সুখ-দৃশ্য ছিন্নবস্ত্রে বাঁধ দেওয়া ভিন্ন বিবাহে আর কোন ব্যাপার নাই। উহারা, রূপ ও বয়সের বিবেচনায়, উপযুক্ত পণ দিয়া কন্যাকে গৃহে লইয়া যায়; সুতরাং উহাদিগের বিবাহ বরের গৃহে। সেখানে, বর ও কন্যার জন্য পৃথক্ একখানি আসন প্রস্তুত থাকে; এবং সে আসনের সম্মুখে

পরিসর কদলিপত্রে পিষ্টক, পক্কান্ন ও সুপক্ক ফল প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্যবস্তু সজ্জিত রহে। যখন বর ও কন্যা, ঘরে আসিয়া, আসনে উপবিষ্ট হয়; তখন বরের একটি সখা বরকে ঘেসিয়া তাহার কাছে বসে; এবং কন্যার একটি সখী কন্যার পার্শ্বদেশে আসন গ্রহণ করে। বরের সখার নাম সওলা, কন্যার সখীর নাম সওলী।

চাকমাদিগের পুরোহিত নাই। খিয়ংথদিগের বিবাহে পুরোহিত যাহা করিয়া থাকে, চাকমাদিগের বিবাহে সওলা আর সওলীদ্বারাই তাহা সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। বাকী থাকে শুধুই অনক্ষর পুরোহিতের মন্ত্র-পাঠ-প্রদর্শনী মুখভঙ্গি। কিন্তু চাকমারা সে অভাব অনুভব করে না, এবং তজ্জন্য দুঃখিত হয় না।

সওলা আর সওলী দাঁড়াইয়া উঠিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করে, "কেমন সকলে সম্মত ত? সকলে স্বীকৃত ত? এখন আমরা প্রকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারি ত?" সভাস্থ সকলে উচ্চৈঃস্বরে উত্তর করে, "হাঁ, ইহাদিগকে সূতায় বাঁধ, ইহাদিগকে সূতায় বাঁধ"। সওলা আর সওলী তখন হাসিয়া হাসিয়া, বর ও কন্যাকে সূত্রকল্প বস্ত্রখণ্ডে বেষ্টন করিতে প্রবৃত্ত হয়; এবং বান্ধনিটা হইয়া গেলেই, নব-দম্পতি, নিঃসঙ্কোচে ও নূতন অনুরাগে,

একে অন্যের মুখে, পক্কান্ন, পক্ক ফল ও নানাবিধ মিষ্টবস্তু তুলিয়া দেয়।

খন্দদিগের বিবাহও, চাকমাদিগের বিবাহের ন্যায়, আরম্ভে আসুর এবং অভ্যন্তরে গৌত্রিক। উহার উপসংহারভাগে রাক্ষস বিবাহের একটু অনুকৃতি আছে। কিন্তু সে অনুকৃতি নিতান্ত উপহাসাস্পদ অভিনয় মাত্র।

সম্প্রতি এ দেশে বাল্যবিবাহ নামে একটা অভিনব শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। বালকের সহিত বালিকার যে বিবাহ হয়, প্রচলিত অর্থে তাহাই বাল্যবিবাহ। খন্দবিবাহকে বাল্যবিবাহ বলা যায় কি না, তাহা শব্দশাস্ত্রের এক খট-মট সমস্যা। কারণ, খন্দবিবাহের বর প্রায়ই নয় দশ বৎসরের শিশু, অথচ কন্যা পোনর ষোল বৎসরের পূর্ণায়তদেহা প্রফুল্লরূপা যুবতী। ঐ রূপ নবযুবতীর সহিত অমন একটি নবোদ্গাত শিশুর নামমাত্র বিবাহকে, বাল্যবিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত হয় কি না, সুবিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ তাহার বিচার করিতে পারেন। যদি দুই দিকের সমান বাল্যাবস্থাই বাল্যবিবাহ নামের ন্যায়সম্মত স্থল হয়, তাহা হইলে খন্দদিগের বিবাহবন্ধন, বাল্যযৌবক বিবাহ বলিয়াই অভিহিত হইবার যোগ্য। পক্ষান্তরে, যে বিবাহের বর যুবা, কন্যা

বালিকা, তাহাও কাজে কাজেই বাল্যবিবাহ নামের বিষয়ীভূত না হইয়া, বাল্যযৌবক অথবা যৌব-বাল্যক নামেরই উপযোগী হইয়া পড়ে। কেন না, ইহা শব্দবিশারদদিগেরও স্বীকৃত কথা যে, বিবাহ পৃথিবীর সকল দেশেই যুগল-ভাবাত্মক অনুষ্ঠান; উহা কোথাও শুধু এক জনের কর্ম্ম নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খন্দবিবাহের প্রথম অনুষ্ঠান আসুরিক। বর শিশু। সে কেমন করিয়া কন্যানির্ব্বাচন করিবে? সুতরাং কন্যা নির্ব্বাচন করে বরের পিতা ও আত্মীয়বর্গ; এবং তাহারা রীতিমত পণ দিতে বাধ্য। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে পণের প্রথা প্রচলিত থাকিলেও, কন্যাকে বিবাহের আগে তুলিয়া লইয়া যাইবার প্রথা নাই। বিবাহের দিন বরের পিতা কন্যার গৃহে বিবিধ ভোজ্য সামগ্রী পাঠাইয়া দেয়, এবং সন্ধ্যাকালে বর লইয়া সেখানে যাইয়া বিবাহকার্য্য সম্পাদন করাইয়া লয়।

বিবাহের পদ্ধতিটা এই।—কন্যাপক্ষের পুরোহিত, কন্যা ও কন্যার পিতা মাতাকে সম্মুখে রাখিয়া, হাতে এক পিয়ালা মদিরা লইয়া, গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান রহে, এবং যখন বর ও বরযাত্রীরা উপস্থিত হয়, তখন সে বর ও কন্যাকে তাহার সম্মুখে টানিয়া আনিয়া, সেই

মদ্যটুকু তাহাদিগকে বারংবার দেখাইয়া নিজের মুখে ঢালিয়া দেন; আর, এক গাছি হরিদ্রাক্ত সূতা লইয়া বর ও কন্যাকে গলায় গলায় বন্ধন করেন। বর এখানে বৎসভাবাপন্ন। কারণ, সে বয়সে নিতান্ত ছোট। বরের গলা কন্যার গলা হইতে প্রায় এক বিঘত নীচে থাকে। পুরোহিত তথাপি কৌশল-সহকারে, দুটি গলাই একত্র করিয়া, সূত্রবন্ধনরূপ মুখ্য কার্য্যটা সম্পন্ন করিয়া ফেলেন। রাত্রিতে শুধুই আমোদ প্রমোদ; রাত্রি প্রভাতে কন্যা হরণের যাত্রাভিনয়। সকলে গাইতেছে, বাজাইতেছে এবং নানারূপ আমোদ প্রমোদে সময় কাটাইতেছে; বরের কোন পিতৃব্য কিংবা একটি পিতৃবন্ধু, ইহারই মধ্যে, দশ-জনের অনবধানতার সুযোগে, কন্যাকে কাঁধে তুলিয়া, চোরের মত, এক দিকে সরিয়া যাইতেছে। যেই কথাটা প্রকাশ পায়, অমনি কন্যাপক্ষীয়েরা ধর্ ধর্ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, এবং বরপক্ষীয়েরা, মার্ মার্ ও সামাল সামাল বলিয়া সারি বান্ধিয়া সম্মুখে অগ্রসর হয়। উভয় পক্ষে ক্ষণকাল এইরূপ একটুকু নাট্যযুদ্ধ হইয়া গেলে, বরযাত্রীরা বর ও কন্যা দুই জনকে লইয়াই বাড়ি চলিয়া যায়।

বিবাহের পরদিবস বাহুযুদ্ধের ঐরূপ একটুকু বিচিত্র

খেলা হয় বলিয়াই, ইহার উপসংহারকে রাক্ষস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু, পাঠক অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, খন্দবিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান শুধুই সূত্রবন্ধন। সুতরাং ইহা সৌত্রিক ভিন্ন অন্য কোন নাম পাইতে পারে না। যদি কোন তর্করত্ন কিংবা তর্কপঞ্চানন এ স্থলে এই রূপ আপত্তি করেন যে, এ বিবাহের পুরোহিত যখন মদিরার পিয়ালা হাতে লইয়া কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তখন ইহাকে মদিরিক বলিয়া নির্দ্দেশ করি না কেন? তাহা হইলে, তাঁহার কথার এই উত্তর দিয়াই উপপত্তি করিব যে, পুরোহিতের কর-ধৃত পিয়ালার একটা ফোঁটাও যখন বর কিংবা কন্যার ঠোঁটে পড়ে নাই, তখন বিবাহটা কোন ক্রমেই মদিরিক সংজ্ঞায় নিবিষ্ট হইতে পারে না। বিবাহ কি বর-কন্যার,—না পুরোহিতের? পুরোহিত যখন পিয়ালার সমস্ত সামগ্রীটুকুই স্বয়ং উদরস্থ করেন, এবং বর ও কন্যাকে প্রসাদের ভাগ দিতেও বিস্মৃত হন, তখন বিবাহের নাম মদিরিক হইবে কোন্ ব্যবস্থায়?

খন্দবিবাহের নবোঢ়া বধূ প্রথম পাঁচ ছয় বৎসর প্রকৃতই পতিগৃহের দাসী। যেখানে পতি অমন শিশু, সেখানে কে তাহার আদর করিবে? কে তাহার দুঃখ বুঝিবে? কিন্তু সেই শিশু পতি যখন নবযৌবন লাভ

করে, তখন বধূদাসীই আবার সকলের উপর রাজমহিষী হইয়া উঠে। তখন অন্যের কথা দূরে থাকুক, বৃদ্ধ শ্বশুর ও বৃদ্ধা শাশুড়ীও তাহার ভয়ে থর-থর কম্পিত রহে। একে স্ত্রী, তাহাতে বয়সে বড়। ঘরের "নও জঙ্গ" * কাজেই তাহার কাছে সতত আজ্ঞাধীন ও অঞ্চলবদ্ধ; এবং "নও জঙ্গ" যাহার কাছে ননীর পুতুল কিংবা নাটুয়া বাছুরের ন্যায় নিয়ত মুখ-প্রেক্ষী, বাড়ির আর সকলে বাধ্য হইয়াই তাহার নিকট অবনত।

বেদ্দা নামে এক পুরাতন জাতি আছে, তাহাদিগের বিবাহ শুধুই সৌত্রিক। তাহারা বরের হাতে সূতার বাঁধ দেওয়া ভিন্ন বিবাহের আর কোন অনুষ্ঠানই অবগত নহে। কিন্তু বেদ্দাদিগের বিবাহের সূতা কোনরূপ সুখ-স্পর্শ সূক্ষ্ম তন্তু নহে। তাহা এক গাছি সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী দড়ী, এবং সে দড়ী হাতে লইয়া গ্রন্থিবন্ধনের কার্য্য সম্পাদন করে স্বয়ং কন্যা।

কন্যার পিতা বরকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আইসে। বর সেখানে সমাগত পাঁচ জনের মধ্যে বরের আসনে উপবিষ্ট হইলেই, কন্যা হাতে একগাছি নূতন

* খন্দেরা ঘরের বড় ছেলেরে "নও জঙ্গ" অর্থাৎ নূতন বীর বলে।

দড়ী লইয়া, জননী কিংবা অন্য কোন পুর-কামিনীর সঙ্গে সভাস্থলে উপস্থিত হয়; এবং জনক জননীর উপদেশ-ক্রমে দড়ী গাছি বরের দক্ষিণ হস্তে ভাল করিয়া বাঁধিয়া দেয়। কন্যা যত কাল জীবিত থাকিবে, ঐ দড়ীর বাঁধও আহারে বিহারে, শয়নে জাগরণে, তত কালই বরের অঙ্গে আভরণের ন্যায় শোভা পাইবে।

যাঁহারা যোগী কিংবা বিরাগী, উল্লিখিত দড়ী তাঁহা-দিগের চক্ষে মায়ারজ্জু। জীব উহাতে বদ্ধ হইয়া, রজ্জু-বদ্ধ পশুর ন্যায়, আকৃষ্ট হইতেছে; এবং ভোগ-লালসার করালগ্রাসে বলিস্বরূপ গড়াইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা ভক্ত ও ভাবুক, ঐ রজ্জুবন্ধন তাঁহাদিগের কাছে হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের নিঃশব্দ সম্ভাষণ। যেন জগন্ময়ী প্রকৃতি জগতের প্রাণ-স্বরূপ অচিন্ত্য পুরুষকে হৃদয়ে গাঁথিয়া রা-খিবার জন্য ঐরূপ গ্রন্থিবন্ধন করিতেছে, এবং প্রেম-ভক্তির পবিত্র সোহাগে, নয়ন বাঁকাইয়া, মৃদু মৃদু বলি-তেছে,—

হাতে দিলাম ডুরি,
খাটবে না চাতুরি,
পায়ে ঠে'লে, যাও বা ফেলে, তাই বেঁধেছি দড়ী।

বেদ্ধা রমণী বুঝুক আর নাই বুঝুক, এবং জানুক আর

নাই জানুক, বুঝি তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে এমনই কোন কথা, প্রকৃতির অধরে, অস্ফুট উচ্চারিত হয়।

৯ম। সুখাগ্নিক বিবাহ।—এ পদ্ধতি বড়ই সহজ-সাধ্য এবং শীতপ্রধান দেশে নিতান্তই সুখ-সেব্য। বর যদি কন্যার রূপ দেখিয়া মোহিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সে আদর করিয়া, হাতে ধরিয়া, বাড়িতে লইয়া যায়, এবং সেখানে দুই জনে ঘরের মধ্যে একত্র বসিয়া আগুন পোয়ায়।

যুবক ও যুবতী এইরূপ আগুন পোয়াইতে বসিলেই পরিবারস্থ পাঁচ জনে তাহা আড়ালে থাকিয়া প্রীতির সহিত দর্শন করে; এবং বরের পিতা মাতা জীবিত থাকিলে, তাহারা ক্ষণপরেই সেখানে আসিয়া সমাগত যুবতীকে, পুত্রবধূ জ্ঞানে সম্ভাষণ করিয়া থাকে। ইহারই নাম সুখাগ্নিক বিবাহ।

বিবাহের অনুষ্ঠানে আগুনের এই রূপ আদর পাঠকের নিকট কোন অংশেও অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয় কি? জগতের জড়বস্তুনিচয়ের মধ্যে, মানুষের কাছে, অগ্নি আর জল এই দুইয়েরই অত্যন্ত মহিমা। মানুষ, আগুন না হইলে, প্রাণে বাঁচে না এবং জল বিনা জীবন-ধারণ করিতে পারে না। এই নিমিত্তই আগুনের নাম

অগ্নি, অর্থাৎ সর্ব্বত্র গমনশীল, সর্ব্বজ্ঞ শক্তি; এবং এই নিমিত্তই জলের নাম জল, অর্থাৎ জীবনের আচ্ছাদক। প্রাচীন আর্য্যেরা বুঝিয়া শুনিয়া বিবাহ প্রভৃতি সকল কার্য্যেই আগুনের পূজা করিয়াছেন; এবং পূর্ব্বোল্লিখিত অনার্য্যেরা, না বুঝিয়াও, শুধু সুখের অন্বেষণে, আগুনের উত্তাপ বুকে লইয়া বিবাহের মত গুরুতর অনুষ্ঠানে আগুনকে সাক্ষিরূপে সম্মান করিয়াছে।

তবে যাহারা গৌণসম্বন্ধে আর্য্য আর অনার্য্য উভয়ের মধ্যবর্ত্তী,—অক্ষয়কীর্ত্তি কৃত্তিবাস প্রাচীন তত্ত্বের অন্বেষণে—পুরাতন গ্রন্থপত্রে—পরিশ্রম না করিয়াও, লঙ্কাসমরের অবসান সময়কেই যাহাদিগের উৎপত্তির সময় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন,—যাহারা তাঁহার বিবেচনায় শ্রীরামচন্দ্রের দক্ষিণাপথবাসী দৃপ্ত সৈনিকবর্গ, এবং লঙ্কেশ্বরের পুর-বাসিনীদিগের সহিত সমান সম্পৃক্ত, তাহাদিগের মধ্যে কিবা বিবাহে কিবা জীবনের অন্যান্য উৎসবে, জ্বলন্ত বহ্নি অপেক্ষা দ্রবীভূত বহ্নিরই অধিকতর আদর পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাহাতে অগ্নির অমল মহত্ত্ব কোন অংশেও স্পৃষ্ট কিংবা বিনষ্ট হয় না।

ভারতীয় আর্য্যললনারা বিবাহের সময় যজ্ঞীয় অগ্নির ধূম গ্রহণ করিয়া কি রূপ সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিতেন,

কাব্যে তাহার চিত্র আছে। সে চিত্রে, কবির তুলিকায়, শুদ্ধি ও সৌন্দর্য্য এবং প্রীতি ও পবিত্রতা বড়ই সুন্দর মিশিয়াছে বলিয়া, এখানে তাহার কিয়দংশ প্রদর্শনের জন্য রঘুবংশের দুইটি শ্লোক তুলিয়া দিলাম।

হবিঃ সমীপল্লবলাজগন্ধী
পুণ্যঃ কৃশানোরুদিয়ায় ধূমঃ।
কপোলসংসর্পিশিখঃ স তস্যাঃ
মুহূর্ত্তকর্ণোৎপলতাং প্রপেদে॥

তদঞ্জন ক্লেদসমাকুলাক্ষম্
প্রম্লানবীজাঙ্কুরকর্ণপূরম্।
বধূমুখং পাটলগণ্ডলেখং
আচার-ধূম-গ্রহণাদ্ বভূব।

অর্থাৎ,—

উঠিল পবিত্র ধূম যজ্ঞের অনলে,
ঘৃত-লাজ-সমী-পত্র গন্ধে সুরভিত ;
ক্ষণেক সে শ্যাম-শিখা বধূর কপোলে
কর্ণের উৎপল সম হইল শোভিত।

ছল ছল আঁখি যেন পরিল অঞ্জন,
আরক্ত আচার ধুমে দুটি গণ্ডস্থল,
কর্ণে ছিল্ল যবাঙ্কুর কর্ণ-আভরণ
ধুমের শিখায় তাহা হইল শ্যামল।

১০ম। সলিলিক বিবাহ।—ইহা সিদ্ধ হয় বর ও কন্যার শরীরে সলিলসেকে। সুখাগ্নিক বিবাহে যে গৌরব অগ্নির, সলিলিক বিবাহে সে গৌরব সলিলের। সলিল সেখানে বিবাহবন্ধনের সাক্ষী, বর-কন্যার সিদ্ধিগুরু এবং অনেক বিষয়েই সুখ-সম্পদের কল্পতরু। তবে অগ্নির বেলায় সুখাগ্নিক বলিয়া, সলিলের সম্পর্কে সুখ-সলিলিক বলিলাম না কেন? এ কথার প্রকৃত উত্তর এই।—পৃথিবীর যে সকল স্থলে সলিলিক বিবাহের বিশেষ প্রতিপত্তি, সে সকল স্থলে গোধূলি লগ্নেই প্রায়শঃ বিবাহ হইয়া থাকে। তার উপর আবার শীতকালটাই, সাংসারিক সুখ-সুবিধা প্রভৃতি নানা কারণে, বিবাহের জন্য প্রশস্ত কাল। যদি বর ও বধূ, শরীরের তন্ত্র সংস্থানে, এবং তৃষ্ণা ও চিত্তবৃত্তির স্ফুরণে, কতকটা মরাল-জাতীয় না হয়, তাহা হইলে, মাঘের শীতে, সন্ধ্যাসময়ে, হর-জটারূপিণী পূর্ণকলসীর কল কল ধারার তলে দাঁড়াইয়া, সলিল-লীলার তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চয় করা সকলের পক্ষে সুখ-জনক নহে।

অনেকে অনুমান করেন যে, সুখাগ্নিক বিবাহের উৎপত্তি স্থান শীতপ্রধান দেশ। এ অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গ্রীষ্মপ্রধান দেশনিচয়কেই সলিলিক বিবাহের উৎপত্তি স্থান বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। পরিব্রাজকদিগের কাছে যাহা জানিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, কথাটা প্রকৃতপ্রস্তাবেও তাহাই বটে। শুনিয়াছি, দক্ষিণভারতের কোন কোন জাতির মধ্যে বর ও কন্যাকে একই পিড়ীর উপর যুগলমূর্ত্তিতে দাঁড় করাইয়া, এক পূর্ণিমা হইতে আর এক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তাহাদিগের মাথার উপর, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে, সাতটি পূর্ণকুম্ভ ঢালিয়া থাকে, এবং এই রূপে চান্দ্রগণনার একটা সম্পূর্ণ মাস প্রাত্যহিক অভিষেক হইলে, তাহা পূর্ণাভিষেক বলিয়া পরিগণিত এবং আরব্ধ বিবাহ পরিসমাপ্ত হয়। বিবাহ আরম্ভ হইবে এক পূর্ণিমায়, সমাপ্ত হইবে আর এক পূর্ণিমায়, এবং প্রতিদিনই এইরূপ সাতটা কলসীর সমান ধারা! এ বড় কঠিন পরীক্ষা।

বেন্দকর প্রভৃতি জাতির বিবাহও শুধুই সলিলিক। বর তাহার বাম বাহুতে কন্যার দক্ষিণ বাহু জড়াইয়া পিড়ীর উপর দণ্ডায়মান হয়, এবং পাড়ার মেয়েরা তাহাদিগের মাথার উপর ভরা কলসী ঢালিয়া দেয়। বিবাহে

যাহা কিছু চাই, তাহা ইহাতেই সংসাধিত হইয়া যায়। এ তেমন দুঃসাধ্য ব্যাপার নহে। কারণ, ইহা একদিনের ব্যাপার। যদি বিবাহের সময়টা সৌভাগ্য বশতঃ নিদাঘের দিনে গড়াইয়া পড়ে,—যে সময়ে কবির ফণী ময়ূরের ছায়াতলে আশ্রয় লইয়া প্রাণ ধারণ করে, যদি তেমনই দিনে বিবাহ হয়, তাহা হইলে সলিল-ধারার তথাবিধ ব্যবস্থায় বিশেষ আপত্তির কারণ থাকে না। কিন্তু শীতের সময় রীতিশুদ্ধ সলিলিক বিবাহ কোন জাতির জন্যই স্বাস্থ্যজনক অথবা প্রীতিবর্দ্ধক বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

১১শ। সৈন্দূরিক বিবাহ।—ইহার একমাত্র সামগ্রী সিন্দূর। বর যদি তাহার বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে একটুকু সিন্দূর লইয়া, কন্যার ললাটে তাহা লাগাইয়া দেয়, তাহা হইলেই এ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের সময়ে কন্যার ললাটে সিন্দূরের ফোঁটা দেওয়া, ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বপ্রকার বিবাহ পদ্ধতিরই অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং "করের কঙ্কণ" ও "কপালে সিন্দূরের টিপ," শুধু এই দুইটি বস্তুই, এ দেশে সধবার চিহ্ন বলিয়া, সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছে। সিন্দূরের ফোঁটা দেশের কবিতা ও সঙ্গীতেও সুখ-সোহাগের আসন পাইয়াছে। যথা,—

" অয়ি সুখময়ী উষে, কে তোমারে নিরমিল,
বালার্ক সিঁদূর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল ? "

কিন্তু যদিও সিঁদূর, অগ্নি ও সলিলের ন্যায়, ভারতবাসী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এইক্ষণ বিশিষ্টরূপে সম্মানিত হইয়াছে, তথাপি সৈন্দূরিক বিবাহ, সুখাগ্নিক ও সলিলিক বিবাহের ন্যায়, একটা স্বতন্ত্র পদ্ধতি। কেন না, অনেক জাতির মধ্যে কন্যার ললাটে সিন্দূর দান ভিন্ন বিবাহে আর কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান হয় না, এবং সিন্দূর দিতে উলুলু কোলাহল ভিন্ন আর কোন মন্ত্র লাগে না।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ভারতের প্রান্তরেখাবর্ত্তী কোন কোন পুরাতন অনার্য্য জাতির মধ্যে, বিবাহের সময়ে, বরের এক ফোঁটা রক্ত কন্যার গায়ে ও কন্যার এক ফোঁটা রক্ত বরের গায়ে লাগাইয়া দিত, এবং যে কার্য্য এক সময়ে রক্তবিন্দুদ্বারা নির্ব্বাহ পাইত, কালক্রমে তাহাই সিঁদূরের সুচারু বিন্দুতে সম্পাদিত হইত। এ অনুমান উচ্ছৃঙ্খল কল্পনামাত্র। ইহা আমার নিকট সুসঙ্গত জ্ঞান হয় না। কোথায় সেই অশিক্ষিত অনার্য্য, আর কোথায় এই উচ্চশিক্ষাভিমানী আর্য্যজাতি। যদি অনার্য্যদিগের সেই প্রাচীন প্রথাই আর্য্যসমাজে আসিয়া সিঁদূর-বিন্দুতে

পরিণত হইয়া থাকে, তবে এখন আর লোকে বরের ললাটেও সিঁদূরের ফোঁটা দিয়া, তাহাকে "পত্মিরাজের" বিচিত্র বেশে সাজাইয়া আনে না কেন? ফল কথা সিঁদূরের উৎপত্তি শোভার তৃষ্ণায়, এবং সধবাই সে অনন্যসাধারণ শোভার অধিকারিণী বলিয়া বিবাহে সিঁদূরের এত বেশী আদর, ও সৈন্দূরিক বিবাহের পৃথক্ প্রচলন। যে সকল জাতির মধ্যে শুধু সিন্দূর-সংযোগেই বর ও কন্যা বিবাহবদ্ধ দম্পতি বলিয়া সমাদৃত হয়, আমি তাহাদিগের কথা প্রসঙ্গতঃ পরে বলিব।

১২ শ। সপ্তাবর্ত্ত অথবা সাপ্তপদিক বিবাহ।—ইহা দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত মুয়াসি প্রভৃতি বিবিধ নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত। এই পদ্ধতির বিবাহ তাণ্ডুলিক বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কারণ, ইহার আরম্ভে, মধ্যে এবং উপসংহারে, তণ্ডুল লইয়া নানারূপ আমোদজনক খেলা কিংবা অনুষ্ঠান আছে। কিন্তু বিবাহের প্রকৃত পরিসমাপ্তি হয় ভনোয়ার নামক একটা বিশিষ্ট বংশদণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে বর-কন্যার সাত বার আবর্ত্তন অর্থাৎ সাত পাক পরিভ্রমণে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাতটি সুরম্য পদাঘাতে। ঐ সাত আবর্ত্তের বিচিত্রতার প্রতি দৃষ্টি করিয়াই বিবাহের প্রকারটাকে

সপ্তাবর্ত্ত কিংবা সাপ্তপদিক নামে পৃথক্ উল্লেখ করিলাম। লক্ষণে কোন দোষ ঘটিল কি না, তাহা পাঠক সমস্ত বিবরণ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন। বিবাহের সময়ে কদলীবৃক্ষ কিংবা পূর্ণকুম্ভের চারিদিকে বর ও কন্যার সাত পাক ঘুরিয়া আইসা অনেক জাতির মধ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু, মুয়াসি প্রভৃতি জাতির মধ্যে ঐ সাত পাকই বিবাহের সার সর্ব্বস্ব।

বিবাহের প্রকৃত কর্ত্তা বর-কন্যার পিতা মাতা। কন্যা যুবতী হইলেই তদীয় পিতা স্বজাতির মধ্যে বরের অন্বেষণ করে এবং বরের পিতা কন্যা দেখিয়া যায়। যদি বর ও কন্যা এই দুইয়ের মনঃপূত হয়, তাহা হইলে কন্যার পিতা কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে পাড়ার কতকটি মেয়ে ও সামাজিকদিগকে ভোজ দেয়; এবং বরের একটি বিশ্বস্ত বন্ধু সেই ভোজে, চারি মণ তণ্ডুল সহ উপস্থিত হইয়া, তাহা সকলের সমক্ষে ওজন করিয়া বুঝাইয়া দিয়া যায়। যখন তণ্ডুলের ঐ রূপ ওজন ও বুঝ হইতে থাকে, তখন কন্যার সমানবয়স্কা সখীরা, কতকগুলি গৃহপালিত ঘুঘুঁর ন্যায়, ঐ তণ্ডুল-রাশির চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, তাহা হইতে অলক্ষিতভাবে, দুই এক মুষ্টি অপহরণের চেষ্টা করে; এবং বরের বন্ধুও তখন ঘুঘুর অত্যাচার

নিবারণের জন্য বাজের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চারি দিকে চক্ষু রাখে। কারণ, যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের একটি তণ্ডুলও কম হয়, তাহা হইলে তাহাকেই তাহা পূরাইয়া দিতে হইবে।

কন্যার পিতৃভবনে সেই তণ্ডুলরাশি লইয়া কিছু কাল এই রূপ রস-লীলা হইয়া গেলে, তার পর রীতিমত বুঝ হয়, এবং তণ্ডুলের বুঝ হইলেই, দেশের প্রথানুসারে বাক্যবিনিময়ের বাধ্যবাধকতা হইয়া যায়। তাণ্ডুলিক বিবাহে তণ্ডুলের আদানপ্রদানেই বিবাহের চরম সমাধান; সপ্তাবর্ত্ত বিবাহে এ তণ্ডুল খেলা বাগ্দানের অনুকল্প অথবা উৎসবের উপক্রমণিকা মাত্র। বোধ হয়, এই রূপ মনে করিতে হইবে যে, কন্যা ঐ দিন হইতে বর-দত্ত তণ্ডুল ভিন্ন আর কাহারও অন্ন মুখে দিবে না।

তণ্ডুল খেলার ঠিক আট দিন পরেই বিবাহ। বিবাহের দিবস বরযাত্রীরা, সন্ধ্যার একটুকু পূর্ব্বে বংশনির্ম্মিত হাতী ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া, সে সকল বাহন বিবিধ কৌশলে চালাইয়া, চলিয়া আইসে, এবং বর তাহার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর স্কন্ধে আসীন হইয়া, সকলের মধ্যে থাকিয়া ধীরে চলে। বন্ধুই সে দিন তাহার সুখের বাহন কিংবা সম্মানের ঘোটক। বেচারা বন্ধু

তণ্ডুলখেলার দিন সখীদিগের সহিত সেই প্রমোদ ক্রীড়া কৌতুকে সুখের ওজনে যাহা কিছু পাইয়াছে, আজিকার এই বর-বাহন-দুঃখে তাহারই যেন তণ্ডুলের ওজনে পরিশোধ হইয়া যাইতেছে। কবি এই জন্যই বলিয়াছেন,—"ন হি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।"

বর ও বরযাত্রীরা যখন বাড়ির খুব সান্নিধ্যে আসিয়া বাজনা বাজাইতে আরম্ভ করে, কন্যার সেই তণ্ডুল-হারিণী তরল-নয়না ঘুঘু সইরা আবার আসিয়া সেখানে উপস্থিত হয়, এবং কন্যার মাতাও মাথায় একটি মঙ্গল ঘটের উপর প্রদীপ বহিয়া তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে আইসে।

ঘুঘুরা এবারও বড় উৎপাত করে। তাহারা যদি তণ্ডুল খেলার দিন এক মুষ্টি তণ্ডুল অপহরণ করিয়া থাকে, আজি তাহারা বরপক্ষীয় বংশারূঢ় বীর যুবাদিগের উপর, প্রত্যেকেই পক্ক তণ্ডুলের দশ বিশটি পিণ্ড, লোষ্ট্রের মত, নিক্ষেপ করিয়া সকলকেই জ্বালাতন করিয়া তুলে। যুবারা আসিয়া তাহাদিগকে ভ্রূভঙ্গির সহিত ধমক দেখায় বটে; কিন্তু আজি আর তাহারা ধমকে কিংবা চমকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে প্রস্তুত হয় না। তাহারা সকলেই হাতে সেই তণ্ডুলপিণ্ডরূপী অব্যর্থ অস্ত্র লইয়া,—আঁচলের

পতাকা উড়াইয়া, অন্তঃপুরের দ্বারদেশে, দলবদ্ধ দণ্ডায়-মান রহে এবং যতক্ষণ না তাহারা উপযুক্ত পারিতোষিক লাভে পরিতুষ্ট হয়, বর ততক্ষণ পর্য্যন্ত কন্যার মুখ-দর্শন সুখে বঞ্চিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে।

কন্যার অন্তঃপুরে বরের জন্য শালগাছের ডালা পালায় একটি কুঞ্জ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্যস্থলে এক বংশদণ্ড, তাহার নাম ভনওয়ার। ভন-ওয়ারের গোড়ায় পল্লবাচ্ছাদিত ভরাকুম্ভ;—কুম্ভের উপর জ্বলন্ত দীপ, পুরোভাগে পেষণী শীলা,—এবং শীলার উপর সুসজ্জিত সাতটি হরিদ্রাক্ত তণ্ডুল-পিণ্ড।

বর যখন কন্যার বস্ত্রাঞ্চলে বদ্ধ হইয়া কুঞ্জের দুয়ারে উপবিষ্ট হয়, তখন সকলের আগে, শাশুড়ী তাহার কাছে যাইয়া তাহাকে আদর করে। শাশুড়ী বরের মুখে ক্রমে পাঁচ মুষ্টি পক্কতণ্ডুল তুলিয়া দেয়; তার পর তার মুখখানি ধোয়াইয়া, আঁচলে তাহা মুছিয়া দিয়া, এক দিকে সরিয়া পড়ে। এ নাটকে শাশুড়ীর কাজ এই পর্য্যন্ত।

বর ও কন্যার পিতা এতক্ষণ পৃষ্ঠভূমিতে থাকে। যেই শাশুড়ী চলিয়া যায়, অমনই তাহারা দুই জন দুই দিক হইতে, দুই ঘড়া জল লইয়া, অগ্রসর হয় এবং দুই

জনেই, মাটিতে বসিয়া, বর ও কন্যার দুর্ল্লভ "পাদপদ্ম" ভক্তির ভাবে ধোয়াইয়া দেয়। বোধ হয়, বর-কন্যার এই রূপ অভ্যর্থনা, ইহাদিগের মধ্যে, মেনকার গৃহে শঙ্কর ও শঙ্করীর অর্চ্চনার মত, চিত্তে প্রীতিকর অনুভূত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধেরা যখন ঐ রূপ পাদ-প্রক্ষালনে ব্যাপৃত রহে, ঘুঘু সইরা, পুনরায় সেখানে, সম্ভবতঃ পায়ের ঘুঙ্গুর বাজাইয়া, দর্শন দান করে, এবং বরকে ক্ষণকাল প্রক্ষিপ্ত-তণ্ডুল-পিণ্ডের স্পর্শসুখ অনুভব করাইয়া লয়।

ইহার পর বিবাহের প্রকৃত অনুষ্ঠান। ঐ যে ভনওয়ার-বংশ,ভরা কুম্ভ সম্মুখে লইয়া,নিরক্ষর ধন-কুবের অথবা নিঃসঙ্গ তাপসের মত, নীরব ও নিস্পন্দ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহাই এ বিবাহের মন্ত্রগুরু অথবা মুখ্য দেবতা। বর ও কন্যা ঐ ভনওয়ারের চতুঃপার্শ্বে ক্রমে সাত পাক ঘুরিয়া আইসে, এবং প্রত্যেক বারের ঘূর্ণনের পর, কন্যা বরের ইঙ্গিতক্রমে, ভনওয়ারের পাদ-মূল-স্থিত সাতটি তণ্ডুল-পিণ্ডের এক একটিকে মৃদুল-পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করে। এই সপ্তাবর্ত্ত অথবা সাত বারের পদাঘাতেই বিবাহের বন্ধন চিরজীবনের জন্য সিদ্ধ হয়, এবং বর কন্যাকে আপনার বিবাহিতা পত্নীজ্ঞানে প্রীতিসহকারে বাড়ি লইয়া যায়।

কন্যার শেষ পদাঘাত প্রত্যক্ষ হইলেই প্রাচীনেরা জয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করে, এবং "হইয়াছে হইয়াছে" বলিয়া কোলাহল করিতে থাকে। লোকে বলে, বর যদি নিতান্ত হতমূর্খ নটবর হইয়াও, বৃথাভিমানের বিষ-জ্বালায়, মণ্ডূকের মত মুখ ভার করিয়া,—গলা ও গাল ফুলাইয়া, ভঙ্গী করিয়া বসিয়া থাকে, এবং পরিবারস্থ পাঁচ জনের সুখ-শান্তির কারণ না হইয়া, সকলকেই নানারূপ উৎপীড়নে অস্থির রাখে, তাহা হইলে বিবাহের কন্যা, কোন কোন দেশে, তণ্ডুল-পিণ্ডশোভি শিলাখণ্ডের উপর পদাঘাত না করিয়া, কালিদাসের বিদ্যোন্মাদতরঙ্গিণীর ন্যায়, বরের কপোলপ্রদেশে পদাঘাত করিতেই বেশী ভালবাসে। কিন্তু পাঠককে ইহা স্পষ্টই জানাইতে হইতেছে যে, বিবাহের পরে, কে কাহারে, দাম্পত্যধর্ম্মের কি ব্যবহারে, পদাঘাতে পরিতর্পণ করে, এ সকল কথার সহিত সপ্তাবর্ত্ত প্রণালী কিংবা ভনওয়ারী পদাঘাত-পদ্ধতির কিছু মাত্র সম্বন্ধ নাই।

১৩শ। তারবিক বিবাহ।—ইহার মুখ্য অনুষ্ঠান সিন্দূরদান। সে অর্থে ইহা সৈন্দূরিক সংজ্ঞারই অন্তর্নিবিষ্ট। কিন্তু এ পদ্ধতিতে বর ও কন্যার আগে বিবাহ হয়, পৃথক্ পৃথক্ রূপে, দুইটি তরুর সহিত; তার পর

বিবাহ হয় মনুষ্যোচিত প্রণালীতে পরস্পরের সুখ-সম্মিলনে। এই জন্যই ইহা তারবিক নামে পৃথক্ বিবৃত হইল। মানভূমের পশ্চিম ভাগে, কুরমী প্রভৃতি বিবিধ জাতির মধ্যে, তারবিক বিবাহই দেশের পুরাতন প্রথা।

এ বিবাহে প্রথম একটুকু নাট্যাভিনয় হয়, তাহার নাম দুয়ারখণ্ড। কিন্তু সে অভিনয়টা যার পর নাই নীরস হইলেও, অনন্যসাধারণ বলিয়া উল্লেখযোগ্য। বর ও কন্যার অভিভাবকেরাই বিবাহের অধ্যক্ষ। যখন তাহাদিগের মধ্যে সমস্ত কথা দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত অবধারিত হয়, তখন বরের সমানবয়স্ক কএকটি সুহৃৎ, কন্যার পিতৃনিবাসে, সহসা অতিথিবেশে উপস্থিত হইয়া, কন্যার রূপ দেখা লইয়া, সেই কেমন এক পরিজ্ঞাত-প্রচ্ছন্নভাবে, ক্ষণকাল আমোদ প্রমোদ করে; এবং কন্যার ভ্রাতৃবন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিরাও, ঐ রূপ অতিথির সাজে, বরের গৃহে যাইয়া, বরের রূপ দেখিয়া আইসে।

অতিথিরা, চিরপরিচিত হইলেও, উল্লিখিত রূপ-দেখার অথবা দুয়ারখণ্ডের অভিনয়ের দিন অপরিচিত। যেন তাহারা পথহারা পথিক,—যেন তাহারা এক দেশে যাইতে পথ ভুলিয়া, কিংবা কোনরূপ বিপদে পড়িয়া, আর এক দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং হাতে

কোন গুরুতর কাজ না থাকা হেতু, গৃহস্বামীর বিবাহ-যোগ্য কন্যা কিংবা পুত্রের অত খবর লইতেছে।

এরূপ প্রচ্ছন্ন পর্য্যবেক্ষণের দিন কতক পরেই বিবাহের প্রকৃত উৎসব। বিবাহের দিন প্রাতঃকালে বর, বাড়ির ছোট খাট একটি আম গাছকে বিবাহ করিয়া, তাহার সহিত সূত্রবদ্ধ হয়, তাহার গায়ে সিন্দূর দেয়, এবং তাহাকে ভার্য্যাজ্ঞানে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, শেষে তাহার কাছে বিদায় লয়। কন্যাও তাহার পিতৃভবনে, সে দিন সেই সময়ে, ছোট খাট একটি মহুয়া গাছের সহিত, বিবাহিত হইয়া, বরের জন্য প্রস্তুত রহে।

কবিতার সুললিত ভাষায় আম গাছের নাম সহকার তরু, এবং মহুয়া গাছটা বোধ হয় মাধবীলতার অনুকল্প। যদি সমালোচিত কুরমীদিগের কাব্যজ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই বরের বিবাহ দিত মাধবী লতার সহিত, এবং কন্যার বিবাহ দিত সহকারের সঙ্গে। কিন্তু কাব্যের সে মধুর ভাব তাহাদিগের মধ্যে বুদ্ধির অভাবে বিপরীত ভাবে পরিণত হইয়াছে।

সহকার-সখা বর, সন্ধ্যার একটুকু পূর্ব্বে, কন্যার গৃহাভিমুখে জাহাজে চড়িয়া যাত্রা করে; মহুয়ার সুখ-সঙ্গিনী অথবা মাধবীর সঙ্গপ্রার্থিনী কন্যাও, তখন বরের প্রতী-

ক্ষায়, বাড়ির মধ্যে একটি বিলাস-কুঞ্জে উপবিষ্ট রহে। বরের সে জাহাজ খানি কোন্ কোম্পানীর, পাঠক কি তাহা এখনও বুঝিতে পান নাই? যাহারা সৌত্রিক বিবাহের বরযাত্রীদিগকে ভাঙা ডাল পালা, অথবা বাঁশের চেলার হাতী ঘোড়া যোগাইয়া থাকে, তারবিক বিবাহের জাহাজ খানিও তাহাদেরই গড়া। জাহাজের উপাদান সামান্য দুই এক খানি তক্তা আর লতা পাতা। বর সেই জাহাজে চড়িয়া, কন্যার গৃহে উপস্থিত হইলেই, পাঁচ জনে তাহাকে কন্যার কুঞ্জ-নিবাসে লইয়া যায়, এবং সে, বহুকণ্ঠ-নিঃসৃত হরিধ্বনির মধ্যে, কন্যার ললাটে সিঁদূরের ফোঁটা দিয়া সুখাসীন হয়। তারবিক বিবাহে গুরুপুরোহিতের গন্ধ নাই। অথচ উহার মন্ত্র আছে। সে মন্ত্র ভক্তির অমিয়মধুমাখা হরি বোল,—মঙ্গল-চিহ্ন সিঁদূরের ফোঁটা, এবং মুখ্য লক্ষণ আগে দুইটি তরুর সহিত বিবাহের ভাণ।

১৪শ। তাণ্ডবিক বিবাহ।—তাণ্ডব অর্থ, উদ্দাম নৃত্য। প্রাচীন গ্রন্থকারেরা পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব এবং স্ত্রী-লোকের নৃত্যকে লাস্য নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার উদ্ধত নৃত্যমাত্রকেই তাণ্ডব সংজ্ঞা দিয়া-ছেন। লাস্য নৃত্য, মধুর বসন্তের মৃদু-সমীর-সঞ্চালিত লহ-রীর ন্যায়, অঙ্গবিক্ষেপের মৃদু মধুর বিলাস-লীলা,—মোহন

অঙ্গদোলন। আমি এখানে যে নৃত্যের কথা কহিতে যাইতেছি, তাহা একটুকু উদ্দাম, একটুকু উদ্ধত, এবং মৃদু লহরীর উপমেয় না হইয়া, তটাভিঘাতিনী তরঙ্গমালারই উপমাস্থল। সুতরাং পুরুষের তাণ্ডব এবং অবলার লাস্য উভয়ই এখানে তাণ্ডব নামে বর্ণিত; এবং তাণ্ডবেরই বিশেষ সম্পর্কহেতু, বিবাহ পদ্ধতিটাও তাণ্ডবিক নামে অভিহিত হইল। এ বড় ঘটার উৎসব এবং ইহার আগাগোড়া সমস্তই উল্লাসের কোলাহলময়।

মায়ূরিক বিবাহে শুধুই বর যাইয়া, কন্যার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত, কিছুক্ষণ নাচিয়া থাকে। তাণ্ডবিক বিবাহের উত্তালতরঙ্গময় নৃত্যের উৎসব, কোন কোন স্থলে, মাসাবধি কাল প্রতি রাত্রিতেই সমান চলে, এবং উহাতে বর নাচে, কন্যা নাচে, বরের সমানবয়স্ক যুবকবৃন্দ,—কন্যার সমানবয়স্কা শত শত যুবতী—আর যার শরীরে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া থাকে, সেই নাচিয়া নাচিয়া উল্লাসে ভাসে।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই তাণ্ডবিক বিবাহের বিশেষ মহিমা আছে। উড়িষ্যার অন্তর্গত ভুঁইয়া ও উরাওঁ প্রভৃতি জাতির মধ্যে তাণ্ডবিক বিবাহেরই অত্যধিক আধিপত্য। ইহারা স্বভাবতঃ নৃত্যপ্রিয়। শৈশব

হইতেই ইহারা নাচিতে শিখে, এবং যৌবনের বসন্ত-সমাগমে নৃত্যকেই ইহারা জীবনের প্রধান সুখ মনে করে। ইহারা স্ত্রী পুরুষে এক সঙ্গে নাচিতে ভালবাসে। সুতরাং ইহাদিগের বিবাহের অনুষ্ঠানে, সম্বন্ধের প্রথম সূচনা হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত, নৃত্যরঙ্গের বিবিধ ঘটাই যে প্রধানতম অঙ্গ বলিয়া প্রীতির সহিত সমাদৃত হইবে, তাহা কোন অংশেও বিস্ময়াবহ নহে।

এই খানে শুধু ভুঁইয়াদিগের বিবাহপ্রসঙ্গেই তাণ্ডবিক বিবাহের পরিচয় দিব। ফুটন্ত অন্নের একটি লইয়া পরীক্ষা করিলেই সমস্তগুলির পরীক্ষা হয়। ভুঁইয়ারা জাতিতে হিন্দু। ইহারা 'বোরাম' ও 'ধরম দেবতা' প্রভৃতি বিবিধ নামে চন্দ্র, সূর্য্য এবং আরও অনেক দেব দেবীর উপাসনা করে। বিবাহ ইহাদিগের মধ্যে দুই তিন গ্রামব্যাপি গড্ডরিক গান্ধর্ব্ব। কেন না, প্রাচীন প্রথার গান্ধর্ব্ববিধানে সাধারণতঃ বিবাহ হয় এক যোড়ায়; ইহাদিগের মধ্যে যখন বিবাহের মৌসুম উপস্থিত হয়, তখন বিবাহ হয় এক সঙ্গে দুই তিন গ্রামের দশ বিশ কিংবা পঞ্চাশ যোড়ায়।

ইহাদিগের ভাষায় যুবার নাম ধাঙ্গর, যুবতীর নাম ধাঙ্গরিণী। ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে, ভুঁইয়া যুবতীরা,

অশিক্ষিত ও অসভ্য হইলেও, পুরাতন আর্য্যের ভাষাগত পবিত্রতার সংস্পর্শে স্ত্রীপ্রত্যয়ে অনুরাগিণী। নহিলে তাহারা, নিশ্চয়ই এত দিনে, নীলমণি মুখোপাধ্যায় ও নৃত্যকালী বসুর ন্যায়, ধনমণি ধাঙ্গর ও গুণমণি ভুঁইয়া হইয়া যাইত।

গ্রামের মধ্যে কিংবা প্রান্তে একটা খোলা স্থান থাকে, তাহার নাম দরবার। যখন চন্দ্রতারাময়ী যামিনী, জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোকে পুলকিত হইয়া, এবং জগৎ-সংসারকে জ্যোৎস্নার আবেশময় আনন্দে আধ' উন্মাদিত করিয়া, মায়াবিনী দেবতার ন্যায়, বিরাজমানা হয়,—যখন নৈশ-সমীর, সে জ্যোৎস্নায় যেন ঈষৎ আর্দ্র ও যেন কেমন এক অপূর্ব্ব গন্ধে সুরভি হইয়া, ঝুরু ঝুরু বহিতে থাকে, তখন গ্রামের ধাঙ্গর ও ধাঙ্গরিণীরা উল্লিখিত দরবারের মাঠে যাইয়া, আত্মহারার ন্যায়, আনন্দে নৃত্য করে। দরবারের চারিদিকে অসংখ্য ছায়াতরু; এখানে ওখানে তরুর ছায়ায় এবং চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় অপরূপ মিশ্রণ; ঊর্দ্ধে আকাশের অমল চন্দ্রাতপ;—এ হেন মনোহারি দরবারে, ইহারা দলে দলে মিলিয়া মিশিয়া, হাতে হাতে গাঁথা হইয়া, নববৌবনের নিরঙ্কুশ উল্লাসে নৃত্য করিতে রহে। যুবক যুবতীর এই রূপ নৈশ-নৃত্য

গুরুজনদিগের জানা শুনা কথা, গুরুগঞ্জনার সম্পর্কশূন্য, এবং নাট্যশিক্ষার মত গ্রামের সাধারণ উৎসব। এক্ষণ বিবাহের উপযোগী অসাধারণ নৃত্যোৎসবের দুই একটি কথা কহিব।

ভুঁইয়াদিগের সমস্ত গ্রামেই দরবার-মাঠের অনতি-দূরে ধাঙ্গরবাসা অথবা ধাঙ্গরিণীবাসা নামে বড় বড় দোচালা ঘর থাকে। গ্রামের বিবাহযোগ্য যুবকেরা ধাঙ্গরবাসায় এবং তাদৃশ ফুটন্ত যুবতীরা ধাঙ্গরিণী বাসায় রাত্রিকালে অবস্থান করে। যখন এক গ্রামের ধাঙ্গরেরা রাত্রিকালে অপর এক গ্রামের দরবারে যাইয়া, সন্নিহিত ধাঙ্গরিণীদিগের নিদ্রাভঙ্গের জন্য, ঝাঁঝর প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে আরম্ভ করে, অথবা ঐ রূপ নিদ্রাশূন্য ধাঙ্গরিণীরা দলবদ্ধ অভিসারিকার বেশে, গ্রামান্তরের দরবারে উপস্থিত হইয়া, হাসির হিল্লোলে কিংবা প্রণয়-গীতির কল-কলে নিকটবর্ত্তী ধাঙ্গরদিগকে আপনাদিগের সুখ-সমাগম-সংবাদ দেয়, তখন দুই দলে যাদৃশ নৃত্য হইতে থাকে, তাহাই অসাধারণ উৎসব। তাহা, অন্ততঃ তাহাদিগের জন্য, প্রকৃতই আবেগময়, উন্মাদজনক এবং আনন্দের একটা প্রবল বন্যাস্রোতের মত।

যুব-জনেরা, মাথায় খোঁপা বাঁধিয়া, বাহুতে অনন্তের

মত একটা পিতলের বলয় পরিয়া, প্রণয়-উপহারের জন্য আয়না, চিরুণী, রাঙা ফিতা, রাঙা সূতা ও পিতলের নানাবিধ চক্‌চকে চারুগহনা সঙ্গে লইয়া, দরবারে প্রতীক্ষু রহে, এবং যুবতীরাও বন-ফুলে ও নানারূপ বন্য আভরণে ভূষিত হইয়া দরবারে যাইয়া, উপহারের সে সকল সামগ্রী প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করে। যুবতীরা তাহার পর বহু প্রকারের উপাদেয় বস্তু স্বহস্তে পাক করিয়া, যুবকদিগকে যত্নের সহিত খাওয়ায়। ইহাতে তাহাদিগের সৌজন্যের পরিচয় এবং কর্ম্মনৈপুণ্যেরও বিশেষ পরীক্ষা। এই রূপ প্রীতি-ভোজের কিছু ক্ষণ পরেই দরবারে নৃত্যের উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গ এবং গীত-বাদ্যের শ্রুতিমধুর নিনাদ উঠে। কেহ মদিরা পান না করিয়া থাকিলেও, সকলেই মদোন্মত্ত, এবং তালে তালে হেলিয়া দুলিয়া ও হৃদয়ের কথা গীতে গাইয়া, নৃত্যের নয়নানন্দ ভঙ্গী ও সঙ্গীতের হৃদয়হারি আকর্ষণে, প্রিয়জনের চিত্ত-প্রীণনের জন্য, উৎসাহে প্রমত্ত।' এই নৃত্যই বিবাহের উপক্রমণিকা। গ্রামের বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধারা ইহা জানিয়া শুনিয়া অনুমোদন করে এবং নৃত্যের পরিণামফল জানিবার জন্য, দূর হইতে গোপনে খবর লইয়া থাকে।

যুবক যুবতীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এক রাত্রির নৃত্যেই আপনার প্রার্থিত জনকে চিনিয়া লইতে পারে। যাহার পিপাসুপ্রাণ অত সহজে পরিতৃপ্তি লাভ না করে, তাহাকে হয়ত আরও দুই চারি কিংবা দশবার রাত্রি নিদ্রাত্যাগ করিয়া নৃত্যগীতের আমোদে ডুবিয়া রহিতে হয়। যখন নিশা শেষ হইয়া আসে,—নৈশ-নৃত্যের অবিরাম-শ্রমে সকলেরই শরীর একটুকু অবসন্ন এবং অধরের তাম্বূলরাগ ঈষৎ বিবর্ণ ও বিস্বাদ বোধ হয়, তখন যুবারা নিতান্ত কাতরকণ্ঠে ও কাতরনয়নে, নিজ নিজ গ্রামে যাইবার জন্য বিদায় চায়। যুবতীরা লতার অনুকৃতি। তাহারা তখনও তাহাদিগকে, যেন লতার ভাবে, হাতে পায়ে জড়াইয়া, কিছু ক্ষণের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখে, এবং এই সুযোগে, সামান্য কিছু অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া, যুবাদিগকে প্রাতর্ভোজের উপহার দানে পরিতৃপ্ত করে।

ছাড়াছাড়িটা ইহার পরেও সহজে হইতে পারে না। যুবারা, যাইবার সময় পুনরায় তাহাদিগের ঝাঁঝর, জগঝম্প ও বাঁশরী প্রভৃতি যন্ত্র বাজাইয়া, তালে তালে পদক্ষেপ করিয়া, আর পিছনের দিকে পুনঃ পুনঃ সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া, দূরতর গ্রামে, স্ব স্ব গৃহাভিমুখে, ধীরে ধীরে যাইতে থাকে; এবং যুবতীরাও নৃত্যাবসাদে ও

নয়নাবেশি নিদ্রার প্রসাদে, অযত্নশিক্ষিত মৃদু-মন্থর-গমনে, বুঝি প্রাণের স্বাভাবিক টানে, বহুদূর পর্য্যন্ত ঘুমন্ত ভাবে নাচিয়া নাচিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করে। গ্রামের প্রান্তসীমা সাধারণতঃ পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর জল-রেখা। যুবারা উহার অপর পাড়ে পৌঁছিয়া, মাটিতে বসিয়া, বিষাদের ভাঙা গলায় দুঃখের গীত গায়। যুবতীরাও এ পাড়ে থাকিয়া তাদৃশ বিষাদের গীতে নিজ নিজ বিষ-জর্জ্জরিত হৃদয়ের দুঃখরাশি ঢালিয়া দেয়। ঐ রূপ গীতালাপের পরিসমাপ্তি হইলে, যুবতীরা ভূমিতে জানুপাত করিয়া যুবাদিগকে বারংবার করযোড়ে অভিবাদন করে; যুবারাও পর পাড় হইতে, প্রীতি ও প্রণতির সহিত, যুক্তকরে প্রত্যভিবাদন করিয়া, শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যায়।

বিবাহের যেটা প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ পরস্পরের অনুরাগলাভ, তাহা দরবারের তরল তাণ্ডবেই প্রাণে প্রাণে ও কানে কানে প্রচ্ছন্ন আলাপে সুসম্পন্ন হয়। বাকি থাকে একটা প্রকাশ্য অনুষ্ঠান, তাহা কএক দিন পরে, উভয় পক্ষের পিতা মাতা ও প্রতিবেশিদিগের গোচরে, কোন শাখার মধ্যে মালা বদলে, এবং কোন শাখায়

শুধু এক সিন্দূরের কৌটায় সুসম্পাদিত হয়। তখন বর ও কন্যা আবার নাচে, এবং বাড়ির সকলেই, সুযোগ পাইয়া নাচিতে থাকে।

তাণ্ডবিক বিবাহে বর ও কন্যার প্রথম মিলন যেমন নৃত্যের দেশব্যাপী উল্লাসে, পরিণয়ের শেষ পরিসমাপ্তিও সেই রূপ নৃত্যের দেশব্যাপী উচ্ছ্বাসে। কেন না,যখন ইহাদিগের মধ্যে বিবাহের সময় উপস্থিত হয়, তখন ঘরে ঘরে এবং যোড়ায় যোড়ায় এক সঙ্গে শত শত বিবাহ। যে এক ঘরে বিবাহের মেয়ে, সে আর এক ঘরে মেয়ের সখী অথবা আইয়। যে সকল যুবা গ্রামান্তর হইতে বিবাহের জন্য বর সাজিয়া চলিয়া আইসে, তাহারাও প্রত্যেকেই আত্মসম্পর্কে বর এবং পরস্পরের সম্পর্কে বরযাত্রী অথবা বরের সখা। যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের বোধ হইয়াছে যেন দেশে বিবাহের একটা সমুদ্র উথলিয়াছে।

১৫ শ। চক্রবাকিক বিবাহ।—ইহা সন্তাল প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি সমূহের বহুশাখায় পুরুষপরম্পরায় প্রচলিত এবং বহুকাল হইতে সম্মানিত। ইহাও তাণ্ডব বিবাহেরই আর এক মূর্ত্তি। অথচ সে মূর্ত্তিটি প্রকার-বৈলক্ষণ্যে নিতান্ত বিচিত্র, এবং আর এক শ্রেণিস্থ যুবক যুবতীর একটুকু বেশী মনোহারিণী।

তাণ্ডবিক বিবাহের ভুঁইয়ারা যেমন জন্মাবধি নৃত্য-প্রিয়, চক্রবাকিক বিবাহের পার্ব্বত্যেরাও সেই রূপ জাতিধর্ম্মে নৃত্যরত। উহাদিগেরও গ্রামের মধ্যে যুবক যুবতীর নৃত্যশিক্ষা এবং নৃত্যচ্ছলে প্রণয়ভিক্ষা অথবা হৃদয়পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দরবার আছে; দরবারের চারি-পাশে বড় বড় ছায়াতরুর ছায়ামণ্ডপ আছে; ছায়ামণ্ড-পের স্থানে স্থানে যুবক যুবতীর নৈশ-বাসের উপযোগী বাসাঘর আছে; জ্যোৎস্নামধুর শারদ-নিশায় কিংবা নিদাঘের মধুর যামিনীতে নৈশ-নৃত্যের আমোদ আনন্দ, হাস্য পরিহাস, এবং উদ্দাম উৎসাহ আছে। তথাপি ভুঁইয়াদিগের তাণ্ডব বিবাহ হইতে উহাদিগের বিবাহ-উৎসব সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। উহাদিগের মধ্যে বিবাহের আগে বিরহের একটুকু সুন্দর ভাণ আছে। ঐটিই বড় নূতন। বর তখন চক্রবাকের অবস্থায়;—এবং কন্যা চক্র-বাকীর ন্যায় বিরহবিধুরা ও বিলপমানা। বাড়ির পাঁচ জনে বর ও কন্যার সে বিরহের দশা দেখিয়া আড়ে থাকিয়া মুচ্‌কে হাসে ও বিদ্রূপ করে। আমিও সেই বিরহবিলাপের কথা মনে করিয়াই এ বিবাহকে চক্র-বাকিক নামে নির্দ্দেশ করিলাম।

এ বিবাহেরও বরনির্ব্বাচন কিঞ্চিৎ পরিমাণে গান্ধর্ব্ব-

প্রথার অনুকারি। কিন্তু সে গান্ধর্ব্ব, তাণ্ডবিক ভুঁইয়াদিগের গড্ডরিক গান্ধর্ব্ব নহে; তাহা সর্ব্বথাই গৌণ-গান্ধর্ব্ব নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। কন্যা মুখ ফুটিয়া কিছু না কহিলেও, পিতা মাতা তাহার মনের কথা টানিয়া লয়; এবং কন্যা যখন যুবতী হয়, পিতা মাতা তখন সর্ব্বদাই তাহার চক্ষের গতি পর্য্যবেক্ষণ করে। সে কাহার সহিত দরবারে বেশী নাচিয়াছে,—কাহাকে দেখিয়া লজ্জায় জড় সড় হয়, এবং লজ্জায় জড়ীভূত রহিয়াও কাহাকে দেখিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক রহে, পিতা মাতা ভাবভঙ্গিতেই তাহা বুঝিয়া থাকে।

এই রূপ আবার বরের ঘরে। পুত্র যখন হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ হইয়া যৌবনশ্রীতে অলঙ্কৃত হয়, তখন পিতা মাতা তাহাকেও এক প্রকার চোখে চোখে রাখে, এবং তাহার চিত্ত পরীক্ষার জন্য, সর্ব্বদাই অলক্ষিতরূপে তাহার পিছনে থাকে। সুতরাং গ্রামের যুবক যুবতীদিগের মধ্যে কে কার জন্য লালায়িত শীঘ্রই তাহা ধরা পড়ে।

কিছু দিন পরে, দুই দিকের অভিভাবকেরা মিলিয়া মিশিয়া দিন নিরূপণ করে, এবং বিবাহের যতটি দিন বাকি আছে, দুগাছি মাজা ঘসা মোটা সূতায় তাহার ততটি গ্রন্থি দিয়া তাহা বরের বস্ত্রপ্রান্তে ও কন্যার আঁচলে

বাঁধিয়া দেয়। ইহারই নাম বিবাহের আগে বিরহ। বর ও কন্যা তখন বিরহে ব্যাকুল হইয়া সেই গ্রন্থি দৃষ্টে দিন গণিতে রহে, এবং এক একটি করিয়া দিন যায়, আর তাহারা দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত এক একটি করিয়া গ্রন্থি মোচন করে।

সেই দৈনন্দিন গ্রন্থি-মোচনের সময় দশ জনে নানা প্রকারে আনন্দ করে। কিন্তু বর ও কন্যা বিরহের অভিনয়ে, বিরলে বসিয়া, দিন গণে এবং বিষাদে ডুবিয়া রহে। হায়! দিন ত যায় না, দিন ত ফুরায় না। পিতা মাতা উভয়েই কি নিষ্ঠুর! তাহারা এক গাছি ক্ষুদ্র সূত্রে কতগুলি গ্রন্থি দিয়াছে! কিন্তু দিনেরও গুমান আছে। বুঝুক আর না বুঝুক, দিনও ক্রোধ ও অভিমান করিতে জানে। দিন শেষে সত্য সত্যই এক দিন ফুরাইয়া যায়, এবং বর যখন বুঝিল যে, তাহাদিগের বিরহের দিন ফুরাইয়াছে, তখন সে, তাহার গুরু লঘু বন্ধু বান্ধব সকলকে যুটাইয়া, বিরহকাতরা বিনোদিনীর দুঃখমোচনের জন্য বিনোদ-বেশে যাত্রা করে।

এ দিকে কন্যাপক্ষও, বরের অভ্যর্থনার জন্য, গৃহে সর্ব্বপ্রকার সুখ-সামগ্রীর আয়োজন করিয়া, প্রত্যুদ্গমনের উদ্দেশ্যে, পথে বাহির হয়, এবং যখন এক দিকের সে

গঙ্গার স্রোত ও আর এক দিকের সে যমুনার ধারা প্রেমের প্রয়াগঘাটে যাইয়া পরস্পর মিলিত ও প্রতিহত হয়, তখন উৎসবের অশ্রুতপূর্ব্ব কোলাহলে সমস্ত গ্রাম প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। তখন সকলেই নাচে, সকলেই গায়, এবং কিবা বৃদ্ধ, কিবা বৃদ্ধা, কিবা যুবা, কিবা যুবতী, সকলেই মদিরার আনন্দে, অথবা আনন্দের মদিরায় বিহ্বল হইয়া, যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়ে। ঐ রূপ ঢলাঢলিতে উপবাসী বরই একটু বেশী অগ্রগণ্য। কারণ, সে অন্তরে বাহিরে সমান ঢল ঢল।

কন্যা তখন কোথায়? সে বেচারী তখনও তাহার বিষাদময় বিরহনিবাসে। কুটীরের মধ্যে একটুকু ক্ষুদ্র স্থান ঐ দিন তাহার কুঠুরী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে সেই পুষ্প-পল্লব-সমাচ্ছাদিত কুঠুরীর মধ্যে—" ক্ষণেক শয্যায়, ক্ষণেক ধরায় "—বিষণ্নবদনা, অ—থ—বা নিদ্রাভিভূতা! বিবাহের সমস্ত উৎসব এইক্ষণ ঘরের মধ্যে সেই বিরহকুঠুরীর দ্বারদেশে। বর-পক্ষ ও কন্যাপক্ষ সকলেই সেই কুঠুরীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া, বিবিধ দুঃশ্রব যন্ত্র বাজাইয়া, যেন কন্যার ঘুম ভাঙ্গিবার জন্য, নাচিতেছে ও গাইতেছে, এবং এক এক জন এক এক বার ঘরের বাহিরে যাইয়া আকাশের পানে তাকাইতেছে।

আকাশের পানে পুনঃ পুনঃ তাকাইবার এই অর্থ যে, রাত্রি তখন কত? কারণ, উল্লিখিতরূপ চক্রবাকিক বিবাহের এই এক কঠোর নিয়ম যে, রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত না হইতে বরের সহিত কন্যার শুভ সম্মিলন সংঘটিত হইতে পারে না। এতদিন ফুরায় নাই দিন, এখন ফুরায় না পোড়া রাত্রি। এ অফুরন্ত অপূর্ব্ব উৎসবের কিছুই যেন ফুরাইতে জানে না। পরিশেষে রাত্রিও যখন ফুরাইয়া আইসে,—যখন সে নিয়ম-নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া যায়, আর আকাশের চন্দ্র তারা ধীরে ধীরে পাণ্ডুবর্ণ হইতে থাকে, তখন সে গভীরা যামিনীর শেষ যামার্দ্ধে, কএকটি পুরন্ধ্রী কন্যাকে একখানি ফুলের সাজির উপর ফুলের সাজে সাজাইয়া, ধরাধরি করিয়া তুলিয়া, কুঠুরীর মধ্য হইতে বরযাত্রিদিগের সম্মুখে আনিয়া রাখে, এবং বর তখন, গুরুজনের উপদেশমতে অগ্রসর হইয়া, চারিদিকের হরিধ্বনির মধ্যে, কন্যার ললাটদেশকে সিন্দূর-বিন্দুতে অলঙ্কৃত করে। এই সিন্দূরদানেই শুভ বিবাহের সুসমাপ্তি। যে মুহূর্ত্তে বর, আপনার বাম করের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে, সিন্দূর লইয়া তাহা কন্যার ললাটে অঙ্কিত করে, সেই মুহূর্ত্তেই বিবাহের মঙ্গল্য অনুষ্ঠান পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার পর

বাকি থাকে বর ও কন্যার অর্থাৎ চক্রবাক ও চক্রবাকীর এক পাত্র হইতে একত্র ভোজন। কিন্তু, তাহা হয় নির্জ্জনে। মেয়েরা তাহা আড়ালে থাকিয়া দেখে। পাঠক বুঝিয়াছেন যে, ঐ সিন্দূরের টিপটি সৈন্দূরিক বিবাহের এবং এই একত্র ভোজনটুকু পৈষ্টিকেরই প্রীতি-কর অনুকরণ।

১৬শ। কপোতিক বিবাহ।—ইহাও পার্ব্বত্যদিগের মধ্যেই প্রচলিত। চক্রবাকিক বিবাহে বর-কন্যার মধ্যে অভিনয় হয় বিরহের, কপোতিক বিবাহে অভিনয় হয় কপোত কপোতীর কমনীয় পূর্ব্বরাগের। বর ও কন্যা আপনারাই আপনাদিগকে স্বসমাজের মধ্য হইতে বাছিয়া লয়; এবং যত দিন না বিবাহ হয়, কন্যা তত দিন তাহার সেই আদরের ধন সত্য সত্যই এক প্রকার আঁচলে বাঁধিয়া রাখে। বর ও কন্যা, পূর্ব্বরাগের ঐ জানা শুনা সোহাগের সময়ে, একখানে বসিয়া খায়, একখানে বসিয়া খেলায়, একে অন্যকে সওলা অথবা সওলী বলিয়া ডাকে, এবং ঘরে ও বাহিরে, হাটে বাজারে, বনে ও উপবনে, দুই জনে সর্ব্বদাই কপোত ও কপোতীর মত এক সঙ্গে বেড়িয়া বেড়ায়। ইহা বর-কন্যার পিতা মাতা অথবা গ্রামের আর কাহারও চক্ষে ঠেকে না। কারণ,

জানাই আছে যে, ইহার নাম প্রণয়ের অভিনয়। বর যদি বিশেষ কোন প্রয়োজনের অনুরোধেও, ক্ষণকালের তরে, বাড়ির বাহিরে কিম্বা একটুকু দূরে যাইতে বাধ্য হয়, কন্যা তাহা হইলে, যেন অমাবস্যার দ্রবীভূত অন্ধকার মুখে মাখিয়া ও ঘরের সকলকে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসের জ্বালায় কিছুকাল অস্থির রাখিয়া, শেষে বৎসহারা গাভীর ন্যায় তাহার জন্য দৌড়িয়া যায়।

বর ও কন্যার গুরুজনেরা, পরস্পরের এই অতিস্ফুট অনুরাগ দেখিয়া, বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, হৃদয়ে যার পর নাই প্রীত হয়। কেন না, নামে না হইলেও কার্য্যে, কপোত ও কপোতীর এই রূপ অনুকরণই, তাহাদিগের পুরুষানুক্রমিক প্রথানুসারে, বিবাহের পূর্ব্বলক্ষণ।

মনুর ব্যবস্থায় শুধুই এক প্রকার গান্ধর্ব্বের নাম আছে। একটা বিশেষ নাম দিতে হইলে উহাকে গুপ্তগান্ধর্ব্ব বলা যাইতে পারে। কারণ, বরের নিতান্ত বিশ্বাসভাজন সুহৃৎ এবং কন্যার প্রাণ-সখীরা ভিন্ন অন্যে তাহার কিছুই জানিতে পায় না। শকুন্তলা যখন মৃদুবাহিনী মালিনীর তটে, কণ্বের শান্তরসাস্পদ স্বর্গপ্রতিম তপোবনে, দুষ্মন্তের রূপ দেখিয়া, বাণ-বিদ্ধ বিহঙ্গীর ন্যায়, গোপনে বিদ্ধ-হৃদয়ে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন, তখন অনুসূয়া এবং প্রিয়ং-

বদার কাছেও তিনি তাঁহার প্রাণের কথা অশেষ-বিশেষে গোপন করিবার জন্য প্রথমতঃ প্রয়াসপর রহিয়াছেন। দুষ্মন্ত তাঁহার প্রিয়সখা মাধব্যকেও সকল কথা প্রাণ খুলিয়া বলিতে সাহস পান নাই। যেন প্রীতির সে প্রথম উন্মেষের পবিত্র আভা মনুষ্যের ভাষায় বর্ণিত এবং মনুষ্যের শ্রুতিবিষয়ীভূত হইলেই তাহাতে পৃথিবীর ছায়া পড়িবে—তাহা বিনষ্ট হইবে। সুভদ্রার উদ্বেল অনুরাগও পুরুষোত্তম কৃষ্ণের রথে পার্থের সারথ্যগ্রহণের পূর্ব্বে সকলের কাছেই গুপ্ত ছিল। ইহাই ঋষিকল্পনার গুপ্তগান্ধর্ব্ব। আমি বন্যজীবনের ব্যবহার দৃষ্টে গুপ্তগান্ধর্ব্বের সঙ্গে গড্ডরিক গান্ধর্ব্ব ও গৌণগান্ধর্ব্ব নামে আরও দুই প্রকার গান্ধর্ব্বের পরিচয় দিয়াছি। কপোতিক বিবাহও চতুর্থ এক প্রকারের গান্ধর্ব্ব, এবং শাস্ত্রীয় সংজ্ঞার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য ইহাকে গুঞ্জর-গান্ধর্ব্ব বলিয়া বর্ণনা করাই সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত। কেন না, কপোত ও কপোতীর শ্রুতিরঞ্জন অব্যক্তগুঞ্জরণই কপোতিক বিবাহের বিশেষ লক্ষণ। ইহার বর ও কন্যা গুপ্ত কিংবা গৌণগান্ধর্ব্বের প্রথানুসারে হৃদয়ের কোন কথাই গোপন না করিয়া, অথচ গড্ডরিক গান্ধর্ব্বের প্লাবনী স্রোতেও ভাসিয়া না যাইয়া, ঘরের বস্তু ঘরে থাকে, এবং গৃহপালিত কপোত ও

কপোতীর ন্যায় অবিরাম গুঞ্জরণে আত্মবিস্মৃত রহে। এ বিবাহের পরিসমাপ্তিও তরল প্রমোদময় তাণ্ডবে, এবং মালাদানের পরিবর্ত্তে সিন্দূরদানে ও অঙ্গুলির সহিত অঙ্গুলির সুখ-গ্রন্থনে।

১৭শ। বীনা-বিবাহ।—পাঠক হয় ত বীনার নাম শুনিয়াই বিবিধ রাগরাগিণীর বিলম্পত এবং শ্রুতিমূর্চ্ছনার ঝঙ্কার-চিন্তায় চিত্তহারা হইবেন। কিন্তু এ বিবাহে যদি বিলম্পত বাজে, সে আর এক প্রকার; এবং ইহার শ্রুতিমূর্চ্ছনার ভৈরব ঝঙ্কারে অনেকেরই প্রকৃত মূর্চ্ছিত হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক। কথাটা তাই ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিব।

বীনা-বিবাহের উপাধিভূত বীনা সুর-বীণ কিংবা সারস্বতী বীণা নহে। উহা সিংহলের প্রচলিত একটি অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যদ্ভুত শিকল।* বীনা এই শব্দটাও প্রকৃত-প্রস্তাবে সিংহলীয়। সিংহলের সম্বন্ধদিগের মধ্যে যে কয়

* বীনা এই নামটি চক্রবাকিক ও কপোতিক প্রভৃতি নামের ন্যায় আমার কল্পিত নহে। নামটি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ।—

"In Beenah marriage (the name is taken from Ceylon) the man goes to live with his wife's family, usually paying for his footing in it by service,' *Chamber's Encyclopedia.*

প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহারই একটির নাম বীনা-বিবাহ। বড় ঘরের বড় আদরের বয়ঃস্থা মেয়েরাই বীনা-বিবাহে অধিকারিণী।

সিংহলের ভাগ্যবতী মেয়েরা,—ভাগ্যবান্ লোকের স্নেহ-লালিত কুমারীরা, বস্তুতঃই বরের পাশে বধূবেশে দাঁড়ায় না। ইহা তাহাদিগের চক্ষে বড় লজ্জাজনক। তাহারা এই হেতু, বরকে বিবাহ করিয়া উলুলুর মত আনন্দময় কলধ্বনির সহিত ঘরে লইয়া যায়, এবং বর সেখানে, ব্যবহারের অপরিহার্য্যশাসনে, এক প্রকার বধূ সাজিয়া, গৃহস্থালীর বিবিধ কার্য্যনির্ব্বাহে নিযুক্ত রহে।

সে দেশের সুন্দরীরা বরের ললাটে সিন্দূর দেয় কি না, এবং বরকে কখনও মুখে ঘোমটা দিয়া রহিতে বাধ্য করে কি না, গ্রন্থপত্রে ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু ইহা প্রকৃতই প্রসিদ্ধ কথা যে, বর তাহাদিগের কাছে, আজ্ঞা-বহ ভৃত্যের ন্যায়, অহোরাত্র দণ্ডায়মান রহিয়া, আড় নয়নে ও ভয়ে ভয়ে, তাহাদিগের মুখশ্রী নিরীক্ষণ করে, এবং কখন কি আদেশ হয়, ইহা জানিবার জন্য কান পাতিয়া রহে।

কঙ্গো জাতির রাজকুমারীরাও বীনা-বিবাহের রমণী-মনোহর পদ্ধতিতেই পতিগ্রহণ করিয়া থাকেন। পতি

যদি তাঁহাদিগের প্রিয়কার্য্যসাধনে অবহেলা করে, তাঁহারা তাহাকে অনায়াসে পদচ্যুত করিতে পারেন। কোন কোন রাজকুমারী পতির শিরশ্ছেদের * আজ্ঞা দিয়া নারীসমাজে একটু নিষ্ঠুর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু সাধারণতঃ সকলেই এই রূপ নিষ্ঠুর নহেন। যাঁহারা কোমলস্বভাবা ও দয়াশীলা, তাঁহারা পতির কোমল অঙ্গে কদাচিৎ ক্রোধাবেশে বেত্রাঘাত করিলে, শেষে তাহা লইয়া পরিতাপ কিংবা পরিহাস করেন; কখনও শির-শ্ছেদের কথা মুখে আনেন না।

পুরুষ,—অথবা পুরুষ নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য অতি নীচ কাপুরুষ,—পৃথিবীর অনেক স্থলেই, অসুর পিশাচের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, অবলার নিগ্রহ করিয়া থাকে। বীনা-বিবাহের এ সকল অবস্থা কি প্রকৃতির পরিশোধ-নিয়মে তাহারই প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা?—অথবা একের পাপে অন্যের দণ্ডবিধান? যে সকল সতী লক্ষ্মীর পবিত্র প্রাণ,

* এ কথাটা আপাততঃ নিতান্ত অদ্ভুত ও অমূলক বোধ হইতে পারে। কিন্তু কথাটা প্রামাণিক ইতিহাসে আছে।—

"In Kakongo Ladies of the blood royal have a liberty to choose what man they like, whether noble or a plebeian; but they have absolute power over him as to life or death, if he offends them." *Astley as quoted by Herbert Spencer.*

সীতা ও সাবিত্রীর পবিত্র প্রতিকৃতিতে একবারে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, বীনা-বিবাহের সমস্ত বিবরণই তাঁহাদিগের হৃদয়ে বিষ-জ্বালার ন্যায় কষ্টকর বোধ হইবে। কিন্তু যাহারা প্রকৃতির বিড়ম্বনায় অবলা হইয়াও অসুর-স্বভাবা কিংবা অশ্বলোলা ডাকিনী, বোধ হয় সংসারের স্থানে স্থানে অদ্যাপি তাহারা বীনার বিবিধ অনুষ্ঠানেই অনুরাগিণী। নহিলে সামাজিক ইতিবৃত্তের এ সকল অদ্ভুত কাহিনীর উপরেও আবার নাটকীয় কল্পনার "তাজ্জব ব্যাপার" কেন?

মান্দ্রাজের নাইয়র জাতির বিবাহও বীনা-বিবাহেরই আর এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। নাইয়রীরা পায়ে নূপুর পরিয়া আনন্দ করিয়া বেড়ান; এবং গৃহপোষ্য পতি, গৃহে থাকিয়া তাঁহাদিগের গৃহকার্য্যের বোঝা বহে। বীনা-বিবাহ সিংহল, কাকঙ্গো এবং অধুনাতন মদ্র দেশেই সীমাবদ্ধ নহে। ইহা পৃথিবীর আরও বহুস্থানে বহুবিধ মূর্ত্তিতে বিরাজমান। বীনা-বিবাহের বর এই এক অংশে বিশেষ ভাগ্যবান্ যে, তাহাকে বধুরূপিণী অধিস্বামিনীর পদপল্লব-সেবন ভিন্ন জীবনের কোন মুহূর্ত্তেই পরাধীনতার আর কোন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। বৈনিক বরেরা অবশ্যই হৃদয়ে এই সিদ্ধান্ত সার করিয়া বসে যে, সে

পদ-পল্লব যদি প্রেমের স্ফূর্ত্তিতে পরিসেব্য হইতে পারে, তাহা হইলে প্রয়োজনের বেলায়ই বা কি জন্য পরিত্যজ্য হইবে?

১৮ শ। বর-বিড়ম্ব বিবাহ। —বীনা-বিবাহের নামটি মধুর। কিন্তু পরিণামটা—অন্ততঃ বরের পক্ষে—যার পর নাই বিরস। বর-বিড়ম্ব বিবাহের নামটা একটু বিরস হইলেও, পরিণামটা উভয়ের পক্ষেই মধুমাখা ও মধুচাখা গোছের।

পৃথিবীর অনেক প্রকার বিবাহই বরের কোন না কোন রূপ বিড়ম্বনায়, অল্প কিংবা অধিক পরিমাণে, পরিচিহ্নিত। সুসভ্য বৃটনদিগের সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত বর, যখন ভজনাগৃহে কিংবা অন্য কোন স্থানে, কন্যার আঙ্গুলে বিবাহের আংটি পরাইয়া, তাহাকে পত্নীজ্ঞানে হাতে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হন, তখন তাঁহার মাথায়, পুষ্প-বৃষ্টির পরিবর্ত্তে, পাদুকা-বৃষ্টি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, ইংলণ্ডে যাঁহারা রাজরাজেশ্বরের পদবীরূঢ়, তাঁহারাও সকলেই মস্তকে এক দিন মসৃণস্পর্শ পাদুকাপুষ্পের অবিরল বৃষ্টিতে কৃতার্থ হইয়াছেন। যদি কোটি কামান-পরিরক্ষিত বীরেন্দ্রকল্প বৃটনেরই বিবাহের সময়ে এ দশা, তবে কোন্ জাতির মধ্যে বিবাহের পর পাড়ার মেয়েরা,

বাসরঘরের বেহায়া খাতায় নিজ নিজ নাম লিখাইয়া, লজ্জার মাথা খাইয়া, বরের কান মলিয়া দেয়, অথবা আরও পাঁচ প্রকারে বরের বিড়ম্বনা করে, সেই সকল কথার আর বৃথা অনুসন্ধানে যাই কেন?

বরের উল্লিখিত রূপ বিবিধ বিড়ম্বনা প্রায়শঃই বিবাহের পরে। যে গলায় রত্নহার পরিয়াছে, সে তাহার বাহুতে ও পৃষ্ঠে বাঁদর ও বাঁদরীদিগের আঁচড়, কামড় এবং কিল ও থাবর প্রভৃতি অনেক প্রকার অত্যাচারই সহিয়া লইতে পারে। কিন্তু যে শ্রেণির বিবাহ শাস্ত্রানুসারে বর-বিড়ম্ব নামের উপযুক্ত, বিড়ম্বনার ভাগটা তাহাতে বিবাহের প্রথম অনুষ্ঠানে। যেমন চক্রবাকিক বিবাহে আগে বিরহ, শেষে বিবাহের আনন্দ, বর-বিড়ম্ব বিবাহেও সেই রূপ আগে মান-ভঞ্জন, তার পর প্রেম।

উত্তর আফ্রিকার কোন কোন জাতির মধ্যে কন্যা উটের পীঠে চড়িয়া বরের দুয়ার পর্য্যন্ত আইসে; বর তাহার কাছে কর-যোড়ে দাঁড়াইয়া নানারূপ স্তুতি মিনতি করিতে থাকে। বর যত ক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার মন ভিজাইতে সমর্থ হয়, কন্যা তত ক্ষণ পর্য্যন্ত সেই উটের পীঠেই, মানিনীর ন্যায়, মাথা হেঁট করিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া, মৌন অবস্থায় মুখ ভার করিয়া রহে।

সিনাই আরবদিগের মধ্যে কন্যা, বরের অনুরাগে হৃদয়ে উন্মাদিনী হইলেও, দশ জনের কাছে আগে তাহাকে চুলে ধরিয়া লাথি মারে, তাহার হাতে কামড় দেয়, এবং সাম্‌নে ঝাঁটা পাইলে তাহা দিয়াই তাহাকে দু' ঘা লাগাইয়া দেয়।

মুঝো জাতির মধ্যে বর, কন্যার গৃহে শুভাগত হইয়া, ক্রমে তিন দিন কন্যার মান-ভঞ্জনে নিযুক্ত রহে। ইহা-দিগের মধ্যে তথাপি এই একটুকু ভাল যে, মান-ভঞ্জনের একটা নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ আছে। মান-ভঞ্জনের অভিনয় তিন দিনের বেশী স্থায়ী হয় না। তিন দিন তিন রাত্রি পার হইয়া গেলেই মানিনী মানের অভিনয় পরিত্যাগ করিয়া প্রেমের অভিনয় করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ঐ তিন দিন বরের বড় কঠোর পরীক্ষা, এবং বিবাহ-বিড়ম্বনারও পরা-কাষ্ঠা। বর হাসিয়া হাসিয়া, কাছে ঘেঁসিয়া, মিঠা মুখের দু'টি কথা শুনিবার জন্য, নানাবিধ মধুর কথার প্রসঙ্গ তুলে; মানিনী অমনই জরাসন্ধের সভাস্থিত মল্ল-বীরদিগের ন্যায়, তাহার মুখের উপর বদ্ধমুষ্টির শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। মুষ্টির উপর যষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে লোষ্ট্রক্ষেপ ও মুহুর্ম্মুহুঃ পদাঘাত ত অবশ্যই মান-ভঞ্জনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু এ বিড়ম্বনা

শুধুই ঐ তিন দিন। উহা বীনা-বিবাহের ত্রিকালব্যাপি তুষ-দাহ-যন্ত্রণা নহে। বর যদি কোন প্রকারে তিনটি দিন অক্ষত দেহে রক্ষা পায়,—অক্লিষ্টচিত্তে কাটাইয়া উঠিতে পারে, তাহা হইলে কন্যা চিরজীবনই তাহার প্রেমের দাসী। এরূপ "মধুরেণ সমাপনং" মোটের উপর নিতান্তই মন্দ কি?

মনুসংহিতার প্রাচীন তালিকায় আট প্রকার বিবাহের বর্ণনা আছে। আমি প্রকৃতির অসংহত তালিকা হইতে পাঠককে আর আঠার প্রকারের বিবরণী উপহার দিলাম। কিন্তু যেমন সমুদ্রের মধ্যে বারিবিন্দু, সাহারার মরুভূমের মধ্যে বালুকণা, উল্লিখিত আট ও আঠার প্রকার বিবাহের অতি ক্ষুদ্র কাহিনীও পৃথিবীর অনন্ত প্রকার বিবাহের ইতিহাসে সেই রূপ একটি অতি ক্ষুদ্র কথা। কে সেই অনন্ত সমুদ্রের ঢেউ গণিয়া শেষ করিবে? কে সেই দিগন্তবিস্তৃত বালুরাশির মধ্যে বসিয়া, একটি একটি করিয়া বালু গণিবে? আমি তথাপি এখানে আরও পাঁচ প্রকার অদ্ভুত বিবাহের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই পাঁচ প্রকার বিবাহই এক দিকে অমানব, আর এক দিকে অপ্রাকৃত। কেন না, মনু ইহার একটিরও কল্পনা করিয়া যান নাই, এবং প্রকৃতির তালি-

কায়ও ইহাদিগের কোন রূপ পরিচয় নাই। সুতরাং ইহাদিগের তালিকার পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হইবে, ইহারা বিকৃতির তালিকাভুক্ত।

প্রথম বণিগ্বহ বিবাহ।—বণিগ্বহ শব্দের সাধারণ অর্থ উষ্ট্র; এখানকার অর্থ মরুভূমিতে উষ্ট্রের ন্যায়, মানব-সমাজে বণিকের সর্ব্বার্থবাহি পর-মর্ম্ম-দাহি বিবাহ-বাণিজ্য। কিন্তু সে বণিক্ কে? যে নিতান্ত উচ্চবংশে জন্ম লাভ করিয়াও প্রকৃতির নীচতায় একং কর্ম্মদোষে পর-শোষক, সেই এখানে বণিক্ শব্দের লক্ষ্য। বণিগ্বহ বিবাহকে দেশের প্রচলিত ভাষায় বেণেতী বিবাহ বলা যাইতে পারে। ইহা প্রাচীন স্মৃতির আসুরিক বিবাহের আর এক পীঠ অথবা আর এক দিক্; এবং ইহার অত্যাচার লইয়াই এ দেশে ইদানীং গ্রামে গ্রামে—পাড়ায় পাড়ায়—"বিবাহ-বিভ্রাট"।

আসুরিক বিবাহে আশা পূরাইয়া অর্থ গ্রহণ করে কন্যার পিতা মাতা, বণিগ্বহ অর্থাৎ বেণেতী বিবাহে আকাঙ্ক্ষারূপ অতল কূপকে আকণ্ঠ পূরিয়া অর্থ শুষিয়া লয় বরের অভিভাবকবর্গ। ইহাতে বিবাহযোগ্য বরের কুঞ্চিত কেশ, পরিসর ললাট, পটোলচেরা চক্ষু, পুষ্পিত দন্তপংক্তি, নিখুঁত নাসিকা, নির্ম্মল বর্ণ, নিরবদ্য হস্ত-পদ,

দেহের ঠাম, কথার ঠাট, এবং বিদ্যাবুদ্ধির ঠ্যাকার, সমস্তেরই পৃথক্ পৃথক্ মূল্য আছে। বিবাহের পূর্ব্বে মাথার চুল অবধি পায়ের নখ পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরই পৃথক্ পৃথক্ মূল্য বর-পক্ষের প্রাপ্য অঙ্কের ফর্দ্দে দফাওয়ারী পরিগণিত হয়।

বর দৈব-দোষে, দেশের কোন পাঠশালায়, কিছু দিন কএকটি হত-ভাগ্য "পাঠ্যপুস্তক প্রণেতার" মুণ্ড চর্ব্বণ করিয়াছিল, অতএব সে পাঠশালার কিছু প্রাপ্য আছে। ইহার নাম পড়ার খরচ। বর যখন তাহার সুকুমার শৈশবে, পরের গাছে পক্ক নিচু দেখিয়া, তাহা না কহিয়া পাড়িয়া আনিবার জন্য চীৎকার করিত, তখন বাড়ির এক জন বৃদ্ধ ভৃত্য তাহাকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া ধরিয়া রাখিত; সুতরাং তাহার কিছু প্রাপ্য আছে এবং সে প্রাপ্যের নাম পরিরক্ষণ খরচ। অপিচ, বরের ধাত্রী তাহাকে এত কাল প্রতিপালন করিয়া বাড়াইয়াছেন, এবং যিনি বরের গর্ব্ভধারিণী মাতা, তিনি দশ মাস দশ দিন কাল, দীর্ঘ দুঃখভোগের পর, বরকে প্রসব করিয়া, তাহার চন্দ্রমুখ দর্শনে সকল দুঃখ ভুলিয়াছেন। তাঁহাদিগেরও অবশ্য পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিশেষ প্রাপ্যের অঙ্ক আছে। তাহার নাম প্রতিপালন খরচ ও প্রসব খরচ।

যাঁহারা, মেয়েবেচার মাথায় ঘৃণা ও ধিক্কারের ছাই ঢালিয়া দিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাঁহারা কি বেণেতী বিবাহের বরবেচারু মাথায় স্তুতির পুষ্পাঞ্জলি দিতে অনুমতি করিবেন? বিক্রয়ের নাম সোজা কথায় বিক্রয় হইলে, দুই দিকেই কি উহা সমান নহে? অপিচ, বর-বিক্রয়ের বীভৎস পদ্ধতি যদি কুল-গৌরবের দোহাই দিয়া তরিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে বীনা-বিবাহের বিলাস-লীলাও কুলক্রমাগত প্রাচীন প্রথার দোহাই দিয়া তরিয়া যায় না কেন?

দ্বিতীয় বৈতনিক বিবাহ।—এ বিবাহের বর, রূপ গুণের বড়াই করিয়া দাবির পরিমাণ বাড়ায় না, এবং কন্যা রূপসী না রাক্ষসী, তাহারও কোন খবর লয় না। পৃথিবীর আর পাঁচ শত প্রকারের মনুষ্য যেমন বেতন পাইলেই আপনার ব্যবসায়-নির্দ্দিষ্ট বাঁধা কর্ম্ম সিধা পথে সাধন করিয়া বিনা বাক্যে চলিয়া যায়; বৈতনিক বিবা-হের বরও দেশের প্রচলিত প্রথানির্দ্দিষ্ট বেতনের অঙ্ক বুঝিয়া পাইলেই, বর-বেশে বিবাহের উৎসব-নিবাসে উপস্থিত হইয়া, আপনার নিয়মিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া এক দিকে প্রস্থান করে।

বৈতনিক বিবাহের বরকে বৈবাহিক পুরোহিত

বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, সে কথাও ঠেলিয়া ফেলা নিতান্ত সহজ হয় না। কারণ, যেমন এ দেশের স্থানে স্থানে, বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য, বৈদিক, তান্ত্রিক, অগ্রদানী ও মহাশ্রাদ্ধী প্রভৃতি বহুশ্রেণির পুরোহিত আছে, বৈতনিক বরও, দেশবিশেষে বিবাহের অনুষ্ঠানে, চতুর্থ এক প্রকার পুরোহিতের মত সমাগত হইয়া, শুধু পুরোহিতের প্রাপ্য লাভেই হৃদয়ে পরিতৃপ্ত রহে। কন্যা হৃদয়হারিণী শরদিন্দু-রেখা, না কুষ্ঠগ্রস্ত পিঙ্গলা, এ কথার সহিত বৈদিক পুরোহিতের কোন সম্বন্ধ নাই, বৈবাহিক পুরোহিতেরও কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। উভয়েই যজমানের সমান হিতৈষী। বিবাহের অনুষ্ঠানে, আপনার উপযুক্ত সংস্থান এবং যজমানের জাতি মান, ইহাই উভয়ের একমাত্র চিন্তার কথা।

বহুযাজী বৈদিক পুরোহিত যেমন যজমানবর্গের নাম, ধাম, গোত্র পরিচয় এবং ক্রিয়াকর্ম্মের বিবিধ বিবরণ খাতায় লিখিয়া রাখিয়া সর্ব্বত্র তদ্দৃষ্টে সময় মত উপস্থিত হয়; বহুবিরাজী বৈবাহিক পুরোহিতও, ঠিক্ সেই দৃষ্টান্তেরই অনুসরণে, আপনার বিবাহিতা ভার্য্যাদিগকে খাতক জ্ঞানে, খাতাবহিতে তাহাদিগের নাম, ধাম ও পিতৃপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া, কেবল বার্ষিক বৃত্তি-

রূপ বেতন-প্রাপ্তির সময়েই তাহাদিগের সংবাদ লয়। ইহাতে কখনও কখনও নিতান্ত মনস্তাপজনক বিপৎপাতেরও সম্ভাবনা হইয়া উঠে। কারণ, মনুষ্য যত কেন কর্ম্মকুশল হউক না, সময়ে সময়ে তাহার স্মৃতিভ্রংশ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং পুরোহিত যদি বুদ্ধির বিপাকে খাতার লিখিত নাম ধাম একে আর পড়িয়া, অথবা বয়সের দোষে তাহা বিস্মৃত হইয়া, আপনার জনের উদ্দেশ্যে পরের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে লোকসমাজে তাহার বড়ই বিপত্তি ঘটে। এই রূপ ভ্রম-প্রমাদগ্রস্ত বৈদিক পুরোহিত সহজেই সারিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভ্রমমুগ্ধ বৈবাহিক পুরোহিতের পক্ষে নিষ্কৃতিলাভ সর্ব্বত্র নিতান্ত সহজ কথা নহে।

তৃতীয়। বৈতরণিক বিবাহ।—ইহাতে আনন্দ নাই, আমোদ নাই, উলুলুর শ্রুতিমধুর ধ্বনি এবং এয়োদিগের নূপুর-নিক্কণ কিংবা কঙ্কণ-ঝনৎকার প্রভৃতি কোন রূপ মঙ্গল্য শব্দ নাই; আছে শুধুই দুই একটি পরিজনের অস্ফুট বিলাপ এবং কন্যার হাড়-পাঁজর-ভাঙ্গা অন্তর্গূঢ় দীর্ঘশ্বাস। বর—যমদ্বারে মহাঘোরে; বিবাহের রাত্রি পার হইবে কি না, তাহারও বিশ্বাস নাই। তাহার কোটরস্থ চক্ষু, চারিদিকের ঝুলিত চর্ম্মে একবারে ঢাকা

পড়িয়া, পাতাঢাকা আইসের মত কখনও একটুকু মিটি মিটি জ্বলিতেছে; গাল দু'খানি দন্তের আশ্রয়বিরহে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া সারিন্দা অথবা সারঙ্গীর মধ্যভাগের উপমাস্থল হইয়াছে; মাথাটি স্কন্ধের উপর আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া, একটা শুষ্ক অলাবুর ন্যায়, দুইটি হাঁটুর মধ্যস্থলে আসিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে; ললাটের দুইটি ভ্রূ নিকটস্থ নিবু নিবু আলোতে অলাবুর উপর আধ' মোছা চূনের রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; এবং সে শ্মশান-প্রতিম শোকাবহ স্থানে তিন চারিটি লোক সোনার পুতুলের মত সুদৃশ্য একটি বালিকাকে পট্টাম্বরে ঢাকিয়া,—তাহার পাশে চিতার আগুনের মত একটা আগুন জ্বালিয়া, যেন লজ্জা ও দুঃখে মাথা নোয়াইয়া, মন্ত্র-পাঠের অনুকরণে বিড় বিড় করিয়া কিছু একটা আবৃত্তি করিতেছে। যদি এই রূপ স্থলেও প্রকৃতই তাহারা মন্ত্র-পাঠ করে, তবে সে মন্ত্র, বিবাহের,—না বৈতরণীর? আর, কতকগুলি প্রাণশূন্য পিশাচের এই রূপ সংঘটনও যদি বিবাহ নামের বিষয় হয়, তবে বৈতরণী আবার কি? বর মনে করিতেছেন ইহাই তাঁহার বিবাহ। বন্ধুবান্ধব অথবা বিজ্ঞপ্রতিবেশীরা মনে করিতেছে ইহা বরের বৈতরণী। অভিধান, উভয়েরই হৃদয়ের দিকে

দৃষ্টি করিয়া বিকৃতির বিকট-ভাষায় শব্দ রচনা করিতেছে—বৈতরণিক বিবাহ।

চতুর্থ। বৃষোৎসর্গ বিবাহ।—বৃষোৎসর্গ শব্দটি শ্রাদ্ধের বিশেষণরূপেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইদানীং ইহা দেশবিশেষে বিবাহের বিশেষণরূপেও ভাষায় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃষোৎসর্গ বিবাহ দুই প্রকার। বৃষের ন্যায় বিপদাবহ অথচ বিষাণশূন্য একটি পশুর কাছে এক সঙ্গে বৎসতরীকল্পা চারিটি কন্যার উৎসর্গ, অথবা একটা বৃষস্যন্তী প্রগল্ভা যুবতীর পাদ-পীঠে বৃষকল্প বৃদ্ধমূর্খের প্রাণোৎসর্গ। প্রাণিজগতে কিংবা মনুষ্যের প্রাকৃত ইতিবৃত্তে এই রূপ বিবাহের নাম গন্ধও নাই বলিয়া সামাজিক বিকৃতির বিড়ম্বিত কাহিনী হইতে ইহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক মনে করিলাম না।

পঞ্চম। দানসাগর বিবাহ।—দানসাগর এই শব্দটিও বৃষোৎসর্গ শব্দের ন্যায় এত দিন শ্রাদ্ধেরই বিশেষণ ছিল। কিন্তু ইদানীং পিতা মাতা উভয়েরই প্রতি শ্রদ্ধার ভাব মনুষ্যের চিত্ত হইতে অপসারিত হইতেছে, এবং শ্রদ্ধায় প্রবল ভাঁটা লাগিতেছে বলিয়া, শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানও সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইতেছে। বিশেষ্য না থাকিলে বিশেষণ থাকিবে কি লইয়া? দানসাগর এই বিশেষণ শব্দও,

এই হেতুই, বাধ্য হইয়া শ্রাদ্ধের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে, এবং দেশে বিবাহরূপ বিশেষ্যেরই বিশেষ ঘটা দেখিয়া তাহার স্কন্ধে যাইয়া আরূঢ় হইয়াছে। কিন্তু উহার গায়ে শ্রাদ্ধের যে গন্ধ ছিল, তাহা আতর গুলাবের সুগন্ধেও দূরীভূত হয় নাই। উহার নব্য অর্থে এখনও সেই পুরাতন শ্রাদ্ধীয় অর্থই ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

শাস্ত্রে আছে যে, শ্রাদ্ধাদি কালে ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র ও প্রদীপ প্রভৃতি ষোলটি বস্তুর দানের নাম ষোড়শ দান। যে শ্রাদ্ধে এক সঙ্গে এই রূপ ষোলটি ষোড়শের দান হইত, প্রাচীনেরা তাহাকেই দানসাগর শ্রাদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিতেন। বিবাহে ষোড়শী-দানই শ্রাদ্ধীয় ষোড়শ দানের অনুকল্প। সুতরাং যেখানে বিবাহের একই উৎসবে, একই আসরে, একই বরের হাতে, এক সঙ্গে ষোলটি ষোড়শীর শুভ-দান-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, মনুষ্যের ভাষা তাহাকে যে দানসাগর বিবাহ বলিয়া বর্ণনা করিবে ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি? যেখানে এক ঘরের চারি পাঁচ ভ্রাতার অবিবাহিত কন্যারা, একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া, একত্র এক জনের কাছে উৎসৃষ্ট হয়, লোকে সেখানেই দানসাগরের অনন্যসাধারণ অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে পাইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে যেমন দানসাগর

শ্রাদ্ধও সমাজে নিত্য ঘটিত না, দানসাগর বিবাহও সেই রূপ এইক্ষণ নিত্য দৃষ্ট হয় না।

শুনিয়াছি,আর এক প্রকার বিবাহ আছে, তাহার নাম প্রেমসাগর, এবং কাব্যে, দর্শনে,—পুরাণে, বিজ্ঞানে,— যোগে, ভোগে ও ভক্তিশাস্ত্রে তাহারই বিশেষ আদর। শুনিয়াছি, সে বিবাহে পুরুষের জ্বলন্ত প্রতিভা অবলা-প্রকৃতির অমিয়রাশিতে স্নাত হইয়া, জ্যোৎস্নার ন্যায় সুখ-শীতল হয়, এবং অবলার স্বাভাবিক কোমলতা, পাদ-পাশ্রয়িণী লতার ন্যায়, পুরুষের পবিত্র আশ্রয়ে কৃতার্থ হইয়া, সকল সময়েই কুসুম-সৌরভে সুরভিত রহে। শুনিয়াছি, সে বিবাহে মহত্ব, মাধুরীর জন্য তৃষাতুর হইয়া, অবলাতেই তাহার উপাসনা করে, এবং মাধুরী পুরুষের স্বভাব-সঞ্জাত সমুজ্জ্বল মহত্বেই তিষ্ঠিয়া থাকিবার স্থান পাইয়া, আর এক মূর্ত্তিতে বিলাসিত হইয়া উঠে। শুনি-য়াছি, সে বিবাহে দু'টি প্রাণ, দুইটি পক্ষীর ন্যায়, পৃথক্ পৃথক্ পিঞ্জরস্বরূপ দুইটি পৃথগ্ভূত দেহে অবস্থিত রহিয়াও, অনুরাগের কেমন এক অলৌকিক আকর্ষণে—একই নাম-গানে—এক হইয়া যায়; অথবা দুইটি শিশির-বিন্দু প্রভাত-পদ্মের বক্ষঃস্থলে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেলে, তাহার উপর যেমন অনন্তবিস্তারিত সুনীল আকাশের

প্রতিবিম্ব পড়ে, দম্পতির সেই একীভূত যুগলপ্রাণেও জগন্ময় অনন্তপ্রাণের অপরূপ এক খানি আলেখ্য অহোরাত্র সেইরূপ শোভা পায়। শুনিয়াছি, সে বিবাহে হৃদয় ও মনের সমস্ত বৃত্তি, প্রীতির সলিল-সেকে সংবর্দ্ধিত হইয়া, প্রতিদিনই নূতন শোভা ও নূতন শক্তিতে বাড়িতে থাকে; এবং প্রেম ও ভক্তি, পরস্পরের স্পর্শে স্বর্গীয় কান্তি লাভ করিয়া, মনুষ্যকে পৃথিবীতেই স্বর্গের পূর্ব্বস্বাদ ভোগ করিতে অধিকার দেয়। ইহাই নাকি প্রেমসাগর বিবাহ, এবং পুরাতন হিন্দুর হর-গৌরী চিত্রেই নাকি ইহার পূর্ণ আলেখ্য। ইচ্ছা হয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহার আনন্দময় উৎসব দেখিয়া প্রাণ জুড়াই। কিন্তু হায়! ইহাও চক্ষে দেখিব না, বিবাহেও আমার প্রবৃত্তি জন্মিবে না। যাহারা 'বীনার' ঝঙ্কার অথবা বৈতরণীর মন্ত্র শুনিতে ভালবাসে, তাহারাই যাইয়া বিবাহ করুক; আমি জ্ঞানানন্দ, যেমন আছি তেমনই একা রহিয়া, আমার এই শান্ত-হৃদয়ে অনন্তের অনন্ত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণে পরিতৃপ্ত রহিব।